শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

ভক্তের জয়

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক
বিরচিত।

কলিকাতা।

৪০নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন,
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩১৬ সাল, ১১ই চৈত্র।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা,
৪৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, বাণী প্রেসে,
শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

ভক্তের জয়

সূচী-পত্র।

কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ 'ভক্ত বড়' করি মানে।
তাহাতে বহুত শাস্ত্রবচন প্রমাণে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ভক্তের জয়।

গণপতি ভট্ট।

(শ্রীশ্রীজগন্নাথের গণেশবেশ।)

উত্তরখণ্ডে কর্ণাটদেশ। কর্ণাটের কাণিয়ারি-গ্রামে এক সর্ব্বসদ্‌গুণ-সম্পন্ন বেদ-বিদ্যা-বিশারদ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম—গণপতি ভট্ট। ভট্টের ভগবানে অচলা ভক্তি। বিষয়চিন্তা ছাড়িয়া ভগবানের চিন্তাতেই তিনি অহরহ নিমগ্ন থাকিতেন। সদাই ভাবিতেন,—এ বিশ্বসংসারের সকল সামগ্রীই,—পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ সকল প্রাণীই,—সুর-অসুর-দিক্‌পালাদি সকলেই বারংবার যাতায়াত করিতে থাকে, কেবল একমাত্র পরব্রহ্ম জগন্নাথই নিত্য সত্য, তাঁহার যাওয়াও নাই, আর আসাও নাই। তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াই সকল প্রাণী সংসারের পারে গমন করে। তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে জীবের উদ্ধারের আর অন্য উপায়ই নাই। কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহাকে পাই কোথায়? সকল শাস্ত্রেই তো দেখি,—তিনি আমাদিগের ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর। তাঁহাকে না পাইলে, তাঁহার কৃপা অধিকার না করিতে পারিলেও তো মুক্তিলাভের অন্য উপায়

নাই। এখন করি কি? আচ্ছা, ভগবানে যখন সকলই আছে, তখন তাঁহাতে এটা আছে ওটা নাই,—এ কথাও তো বলিতে পারা যায় না। অণুও তিনি বৃহৎও তিনি, সগুণও তিনি নির্গুণও তিনি, সূক্ষ্মও তিনি স্থূলও তিনি। তিনি নন—এমন কিছুই যখন এ সংসারে থাকিতে পারে না, তবে তাঁহার—ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপের মত ইন্দ্রিয় ও মনের গোচর স্থূল রূপও তো থাকিবার কথা। আহা, তাঁহার সেই স্থূল রূপ কোথায়—কোন্ পুণ্যধামে বিরাজ করিতেছেন? যদি তত্ত্ব পাই, তখনই তাঁহার উদ্দেশে প্রধাবিত হই; এই চর্ম্মচক্ষে তাঁহাকে দর্শন করি, আর তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাতনাপথ অতিক্রমপূর্ব্বক পরমানন্দময় মোক্ষপদের অধিকারী হই। আহা, সেই শুভদিন আমার কবে হইবে?

ভট্ট ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া কেবল এই কথাই ভাবেন, আর তন্ন তন্ন করিয়া, সকল শাস্ত্র অনুসন্ধান করেন। এইরূপে কিছু দিন যায়; ভট্টের উৎকণ্ঠার আর সীমা পরিসীমা নাই। শাস্ত্র দেখিতেদেখিতে একদিন তিনি ব্রহ্মপুরাণে দেখিলেন,—

"স্থূলস্বরূপ গোটি ধরি। ব্রহ্ম অচ্ছন্তি নীলগিরি॥
তান্কু দেখন্তি যেউঁমানে। মুকত হুয়ন্তি দর্শনে॥
ন গমে যম দরশন। সকল শাস্ত্রে এ প্রমাণ॥"

পরমব্রহ্ম স্থূলস্বরূপ ধারণ করিয়া শ্রীনীলাচলে বিরাজ করিতেছেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবে, সে-ই মুক্তিপদের অধিকারী হইবে। তাহাকে আর যমভবনে যাইতে হইবে না।

ব্রহ্মপুরাণের এই বচন পাইয়া ব্রাহ্মণ আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। ইষ্টদেবতার ন্যায় বচনটি হৃদয়পদ্মে ধারণ করিলেন। তখন তিনি নির্ব্বেদভরে প্রাণে প্রাণে বলিয়া উঠিলেন,—

"বোইলা—ধিক এ সংসার। ধিক এ মায়াজাল মোর॥
ধিক মো দারা সুত ধন। ধিক অটই এ জীবন॥
এ মর্ত্ত্যপুরে দেহ ধরি। ব্রহ্ম অচ্ছন্তি নীলগিরি॥
আজর যাএ মুঁ ন জানে। ভ্রমুঁ অচ্ছই অকারণে॥
যাহাকু নয়নে দেখিলে। জীব নিস্তার হোএ ভলে॥
যে গতাগত পথ জানি। রহে ব্রহ্মর দেহে মণি॥
সে ব্রহ্ম ছাড়ি মূঢ়পণে। মুঁ এথি থিবি কি কারণে॥
দারা তনয় ধন যেতে। কে যিব মোহর সঙ্গতে॥
দেহে সমর্থ থিবা যাএ। সবুরি বন্ধু হোই থাএ॥
বয়স হেব যেবে শেষ। দারা-পুত্রকু হোএ বিষ॥
আউ কে অটই কাহার। দেহ ত নোহে আপনার॥"

এ সংসারে ধিক্, আমার এ মায়াজালে ধিক্, স্ত্রী-পুত্র-ধনে ধিক্, এ জীবনে ধিক্। সেই ব্রহ্মবস্তু এই মর্ত্ত্যপুরেই দেহ ধারণ পূর্ব্বক নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, আজিও আমি জানিতে না পারিয়া অকারণে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। আহা! যে ব্রহ্মকে নয়নে দেখিলে জীব অনায়াসে নিস্তার লাভ করে এবং গতায়াতের পথ অবগত হইয়া সেই ব্রহ্মের দেহেই লীন হইয়া যায়; হায়! আমি অতিশয় মূঢ়, তাই তাঁহাকে ছাড়িয়া এতদিন এই অসার সংসারে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। কিন্তু আর এ সংসারে থাকি কেন? স্ত্রীপুত্র ধন কেহই ত আমার সঙ্গে যাইবে না? যত দিন দেহ সবল, ততদিনই এই দেহ সকলের বন্ধু হইয়া

থাকে। বয়স শেষ হইয়া আসিলে এই দেহই আবার স্ত্রী-পুত্রেরও 'বিষ' বলিয়া বোধ হয়। অহো! এই দেহই যখন আপনার নহে; তখন আর অন্য কে-ই বা কাহার?

ভট্ট মনেমনে এইরূপ আলোচনা করিয়া অবধারণ করিলেন, আমি অবিলম্বে নীলাচলে গমন করিব এবং সেই ব্রহ্ম দর্শন করিয়া অনায়াসে মুক্তিপদ লাভ করিব। তিনি আর কালবিলম্ব করিলেন না,—সংসারের মায়া-মমতা ও দেহের আশা-ভরসা বিসর্জ্জন দিয়া বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গের সম্বল রহিল কেবল সেই ব্রহ্মের অমৃতময় নাম আর ব্রহ্মপুরাণ।

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস চলিয়া গেল, কিন্তু ভট্টের পথ-চলার আর বিরাম নাই। ভিক্ষা জুটিল তো ভিক্ষায়, না হয় কেবল পত্র ফল মূল—যে দিন যাহা জোটে, ভট্টের তাহাই আহার; কিছু না জুটিলে উপবাস করিতেও তিনি কাতর নহেন। পানীয় জলেরও তাঁহার বিচার নাই; তা নদীরই হউক, কূপেরই হউক কিংবা পুষ্করিণীরই হউক। পিপাসার সময় একটু পাইলেই হইল। এক ব্রহ্ম-চিন্তা ছাড়া ভট্টের আর অন্য চিন্তাও নাই—ভয়ও নাই। ভয় থাকিবেই বা কিসে?—

"ব্রহ্মরে লাগি অছি লয়। তেনু তা কিছি নাহি ভয়॥"

এইরূপে বহুদিন বহুদেশ অতিক্রম করিয়া ভট্ট আঠারনালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আঠারনালা নীলাচলের অতি নিকটেই। এই স্থানের মাহাত্ম্যও অতীব বিচিত্র। তথায় প্রবেশ মাত্রই জীব যমদণ্ডকে জয় করিয়া থাকে। ভট্ট এই পবিত্র স্থান

দর্শন করিয়া চর্ম্মচক্ষু সার্থক করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের উপর আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। তিনি তথায় নিশ্চল আসনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মচিন্তা করিতে লাগিলেন।

গণপতি ভট্ট ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বসিয়াই আছেন। থাকিতেথাকিতে দেখিলেন,—কতকগুলি লোক তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই হস্তে 'অবঢ়া' (অন্ন মহাপ্রসাদ)। সকলেই আনন্দে আত্মহারা। কেহ বা উচ্চৈস্বরে গান গাহিতেছেন, কেহ বা নানা রঙ্গের অবতারণা করিতেছেন; আবার কেহ বা হাসিয়াহাসিয়া অপরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছেন। সংসারের শোক-তাপ জ্বালাযন্ত্রণা যেন তাঁহারা জানেন না।

সকলকেই সম আনন্দে আনন্দিত দেখিয়া ভট্ট বিস্ময় সহকারে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পথিকগণ! তোমাদের এত আনন্দ কিসের? তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? কি লাভই বা পাইয়াছ? ভট্টের কথার উত্তরে পথিকগণ বলিলেন,—বিপ্রবর! আমরা নীলাচলে গিয়াছিলাম, তথায় পাঁচ দিন থাকিয়া প্রাণ ভরিয়া ব্রহ্মদর্শন করিয়া শ্রদ্ধাপূত-হৃদয়ে আবার গৃহে ফিরিয়া চলিতেছি। এ সংসারে ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ কি-ই বা হইতে পারে?

ভট্ট এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভীভূত হইয়া রহিলেন। পরে সংশয়-সমুদ্বেলিত-হৃদয়ে তাঁহাদিগকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—পথিকগণ! বল বল, সত্য করিয়া বল,

তোমরা যথার্থই কি সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছ? পথিকগণ "হাঁ সত্যসত্যই দর্শন করিয়াছি" বলিয়া চলিয়া গেলেন। তখন এক অভিনব চিন্তায় ভট্টের হৃদয় তোলপাড় করিয়া তুলিল। তিনি মনেমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—পথিকগণ বলিলেন,—এখানে ব্রহ্ম আছেন, আর তাঁহারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন; এ সকল কথা নিশ্চয়ই মিথ্যা। কেন না, যাঁহার দর্শন লাভ করিলেই মুক্তি, সেই ব্রহ্মকে দেখিয়া ইহাঁরা আবার ফিরিয়া আসিলেন কি প্রকারে? ইহাঁদের তো ব্রহ্মশরীরে মিশিয়া যাইবারই কথা।

ভট্ট অশান্ত-হৃদয়ে বসিয়াবসিয়া দেখিতে লাগিলেন,—ঐরূপ আনন্দ-উল্লাস করিতেকরিতে দলেদলে যাত্রিকদল অবিশ্রান্ত গমন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে সকলেরই মুখে ঐ একই কথা। পথিকগণের কথা শুনিয়া কিন্তু ভট্টের সংশয় অপনীত হইল না, বরং বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ব্রহ্মপুরাণ খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন, পুরাণ-বচন দেখিতে তো ভুল করি নাই। দেখিলেন,—না, আমার তো দেখিবার ভুল হয় নাই, পুরাণে যে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে—"ব্রহ্ম অচ্ছন্তি নীলগিরি।"

ব্রাহ্মণ পুরাণবচন বারংবার পড়িলেন, কিন্তু মনের সংশয় মিটিল না। তিনি তখন ভাবিতে লাগিলেন, এখন করি কি? লোকের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয়, ব্রহ্ম নীলগিরিতে নাই; কেন না ব্রহ্ম দর্শন করিয়া তো ফিরিবার কথা নহে;

বরং ব্রহ্মের অঙ্গে মিশিয়া যাইবারই কথা। আবার এ দিকে পুরাণেও দেখিতেছি—ব্রহ্ম নীলাচলে আছেন। এখন কাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করি? এক দিকে সাক্ষাৎ লোকের চোখে দেখা কথা, আর এক দিকে পুরাণের পুঁথিগত কথা। কোন্ কথাই বা বেশী বিশ্বাসযোগ্য? এইরূপ কত কি ভাবিতে-ভাবিতে ব্রাহ্মণের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তিনি "ন যযৌ ন তস্থৌ" হইয়া রহিলেন। মনেমনে স্থির করিলেন,—গৃহদ্বার যখন একবার ছাড়িয়া আসিয়াছি, তখন সেখানে আর ফিরিয়া যাইব না; নীলাচলে যখন ব্রহ্ম নাই, তখন সেখানেও আর যাইবার দরকার নাই। দুইদিকের কোন দিকেই শান্তি নাই। ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার তো আর এ পাপ জীবনে ঘটিল না; তখন এ জীবন না রাখাই ভাল। দুই দিকের কোন দিকেই যাইয়া কাজ নাই, কালকূট বিষ ভক্ষণ করিয়া এইখানেই জীবন বিসর্জ্জন দিই। আত্মহত্যা—আত্মহত্যা,—আত্মহত্যাও যে মহাপাপ! তাহাই বা করি কি প্রকারে?

ভট্ট এইরূপ ভাবিতেছেন। ভাবগ্রাহী ভগবান্ তাহা জানিতে পারিলেন। জানিবেন না-ই বা কেন?—

"সে সর্ব্ব-অন্তর্যামী হরি। সকল ঘটে চ্ছন্তি পূরি॥
ভগত-মন যার ঘর। তাহাকু কিস অগোচর॥"

একেতো ভগবান্ সকলেরই অন্তর্যামী, সকল ঘটেই তিনি পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাহার উপর আবার ভক্তের মনই তাঁহার নিত্য নিকেতন, গণপতি ভট্ট সেই ভগবানের অকপট

ভক্ত, সুতরাং ভট্টের হৃদয়ের কথা কি কখনও ভগবানের অগো-চর থাকিতে পারে ?

ভক্তাধীন ভগবান্ আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ এক ব্রাহ্মণ-স্বরূপ ধারণ করিয়া ভট্টের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মাণ্ডের নাথ হাসিতেহাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিপ্রবর! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? এখানে বসিয়াই বা আছেন কেন? কোন্ স্থানেই বা যাইবেন মনে করিতেছেন? আপনাকে এত দুঃখিতই বা দেখিতেছি কেন? আমাকে অকপটে তাহা বলুন।

সেই অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণমূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার অমৃতমধুর কথা শুনিয়া ভট্টের অশান্ত হৃদয় যেন কতকটা শান্ত হইল। তিনি বিনয়-সহকারে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—মহাশয়! ব্রহ্ম স্থূল রূপ ধারণপূর্ব্বক নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, আর তাঁহাকে দেখিলেই জীবের দুঃখ দূর হইয়া যায়, ব্রহ্মপুরাণে এই কথা পাঠ করিয়া আমি ব্রহ্মদর্শন-মানসে নীলাচলে যাইতে-ছিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া অবগত হইলাম যে, ব্রহ্ম নীলা-চলে নাই। তাই বিষণ্ণ-মনে এখানে বসিয়া রহিয়াছি।

বিপ্ররূপী ভগবান্ ভট্টকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্ম যে নীলাচলে নাই, ইহা আপনি কি প্রকারে জানিলেন? ভট্ট বলিলেন,—বিপ্রচূড়ামণি! ব্রহ্মদর্শন করিলে তো ব্রহ্মের শরীরে সকলেই লয় প্রাপ্ত হয়, অথচ আমি এখানে বসিয়া প্রত্যক্ষই দেখিতেছি, শতশত লোক ব্রহ্মদর্শন করিয়া আবার ফিরিয়া

আসিতেছে, তবে কেমন করিয়া বলি যে, ব্রহ্ম নীলাচলে রহিয়াছেন।

ভট্টের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ মৃদুমন্দ হাস্য করিতেকরিতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—

"বোইলে—শুন বিপ্রবর। তো মনে সংশয় না কর॥
ব্রহ্ম ন থিবা এ প্রমাণ। তাহা কহিবা এবে শুন॥
যে আত্মা কল্পতরু হরি। যে যাহা মনে বাঞ্ছা করি॥
তাহাঙ্কু সেহি ফল দেই। তেমুটি বাঞ্ছানিধি সেহি॥
যেবন প্রাণী এথে আসি। দর্শন করে ব্রহ্মরাশি॥
কল্পনা করি তাঙ্ক মনে। লেউটি-যিবাকু সদনে॥
তাহাঙ্কু যদ্যপি রখিলে। কি বাঞ্ছানিধি বোলাইলে॥
এমু যে যাহা কল্পি থাই। তাহাকু সেহি ফল দেই॥
পেশন্তি প্রভু মহামেরু। তেমুটি বাঞ্ছাকল্পতরু॥
যেবন লোক মুক্তি অর্থে। নিশ্চয় আসিথিবে এথে॥
তাহাঙ্কু মুক্তিপথ দেবে। তু বিপ্র নেগে যাঅ এবে॥
মনে তু সংশয় ন কর। ব্রহ্মঙ্কু দরশন কর॥"

কল্পবৃক্ষের কাছে যে যাহা চায়, সে তাহাই পাইয়া থাকে। পরমাত্মা শ্রীহরিও বাঞ্ছাকল্পতরু। তাঁহার কাছেও যে যাহা চায়, সে তাহাই লাভ করে। যে সকল লোক সেই পরব্রহ্ম শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহে, তিনি সেই সকল লোককে আটকাইয়া রাখেন না; গৃহেই ফিরাইয়া দেন। যে গৃহে ফিরিয়া যাইতে চায়, তাহাকে আটকাইয়া রাখিলে তিনি আর বাঞ্ছানিধি বলাইবেন কি প্রকারে? আবার যদি কেহ তাঁহার কাছে দৃঢ়চিত্তে মুক্তিরই প্রার্থনা করে, তিনি তাঁহাকে মুক্তিই প্রদান করিয়া থাকেন; তাঁহাকে আর ঘরে ফিরাইয়া দেন না। বিপ্রবর! তুমি আর বিলম্ব করিও না, মনের সংশয়

দূর করিয়া নীলগিরিতে গমন কর,—ব্রহ্ম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও।

এই কথা বলিয়া বিপ্ররূপী ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। ভট্টও পরমানন্দে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মনের আবেগে অল্প সময়ের মধ্যেই সিংহদ্বারে পতিতপাবনদেবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দৈবযোগে সেই দিনই স্নানযাত্রা। তাই দেবাদিদেব জগন্নাথ দেউল পরিত্যাগ করিয়া স্নানমণ্ডপে শুভ বিজয় করিয়াছেঁন। তাঁহার চারিদিকে সেবকবৃন্দ অশেষ তীর্থের জল লইয়া জয়জয়-ধ্বনি করিতেছেন। দেব-স্নান দেখিবার নিমিত্ত দেবগণও স্বর্গ হইতে আসিয়া মানুষের সহিত মিলিয়া মিশিয়া মহামহোৎসব করিতেছেন। হরিহরিধ্বনিতে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা নাই। এমন সময় গণপতি ভট্ট স্নানমণ্ডপে যাইয়া উপস্থিত।

ভট্ট দারুব্রহ্ম দর্শন করিলেন। একবার নয় দুইবার নয়, শতশতবার তিনি দারুহরিকে নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণের অভাব মিটিল না। তিনি মাথায় হাত দিয়া একটি সামান্য প্রণামও করিলেন না; যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া চলিলেন। ভট্টের দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই।

ভট্টের হৃদয়ের ভাব,—গণেশই একমাত্র ব্রহ্ম। যাঁহার গজানন নাই, তিনি কখনও ব্রহ্মই হইতে পারেন না। ইহাঁরও যখন গজবদন নাই, তখন ইনিও ব্রহ্ম নহেন।

ভক্ত ভট্টের হৃদয়ের কথা ভক্তহৃদ্বিহারী শ্রীহরির জানিতে বড় বিলম্ব হইল না। অন্তর্য্যামী নারায়ণ তখনই অলক্ষ্যভাবে জগমোহনে গমন করিলেন। পূর্ব্ব দিবস প্রভুর পার্শ্বে রাত্রি-জাগরণ-প্রযুক্ত 'মুদিরথ' * পণ্ডা তথায় নিদ্রালস হইয়া শয়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহার কাছে গিয়া স্বপ্নমার্গে আদেশ করিলেন— মুদিরথ! উত্তরদেশ হইতে আমার এক পরম ভক্ত পরমানন্দে আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার ধারণা—যাঁহার গজানন নাই, তিনি কখনও ব্রহ্ম নহেন। আমার গজমুখ না দেখিয়া ভক্ত মহাদুঃখে বিমুখ হইয়া চলিয়া যাইতেছে, তুমি শীঘ্র যাও, যাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস। গিয়া এই কথা বল যে, ওহে ঋষি! তুমি ফিরিয়া যাইতেছ কি নিমিত্ত? তুমি আমার সহিত আইস, নিশ্চল নেত্রে চাহিয়া দেখ দেখি, গজানন দেখিতে পাইবে এখন।

এই কথা বলিয়া অন্তর্য্যামী অন্তর্হিত হইলেন। মুদিরথও তাড়াতাড়ি উঠিয়া হরিনাম করিতেকরিতে গণপতি ভট্টের উদ্দেশে দৌড়াদৌড়ি গমন করিলেন। অচিরেই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—

---

* 'মুদিরথ'—শ্রীজগন্নাথের সেবক পণ্ডা বিশেষ। ইঁহারা পুরীরাজের প্রতিনিধিরূপে শ্রীজগন্নাথের সেবা করিয়া থাকেন। ৭ বৎসর হইতে ১২ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইঁহাদের সেবায় অধিকারকাল নিরূপিত। অনেকে বলেন যে,— "মুদ্রহস্ত" হইতে এই শব্দের উৎপত্তি। ইঁহারা অনেক সময় শ্রীপ্রভুর সম্মুখে মুদ্রিতহস্তে—জোড়হস্তে অবস্থান করেন।

"বোইলা—শুন বিপ্রগোটি। কিপাঁ তু যাউছ্ছ লেউটি ॥
ব্রহ্মকু দরশন কর। বাঞ্ছা সম্পূর্ণ হেউ তোর ॥
যে চতুর্ব্বর্গ-ফলদাতা। অশেষ জীবর করতা ॥
ভগতজন প্রাণবন্ধু। নাম করুণাময় সিন্ধু ॥
যে যাহা বাঞ্ছা করে চিত্তে তাহাকু তাহা দেবা অর্থে ॥
বিজয় নীলাচল গিরি। শ্রীদারুব্রহ্ম রূপ ধরি ॥
তাহাঙ্কু ছাড়ি মূঢ়পণে। লেউটি যাউ কি কারণে

ব্রাহ্মণ! তুমি ফিরিয়া যাইতেছ কেন? চল ব্রহ্ম দর্শন কর, তোমার বাঞ্ছা সম্পূর্ণ হউক। যিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল দান করেন, যিনি সমগ্র জীবের কর্ত্তা, যিনি ভক্তজনের প্রাণের বন্ধু, যাঁহার নাম করুণাসিন্ধু, তিনি সকলের বাঞ্ছিত ফল দিবার নিমিত্ত শ্রীদারুব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়া নীলাচলে বিরাজ করিতেছেন। মূঢ়তা প্রযুক্ত তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া অকারণে চলিয়া যাইতেছ কেন?

মুদিরথের কথা শুনিয়া গণপতি ভট্ট অতিশয় ক্রোধভরে কটু কথা কহিয়া ফেলিলেন,—ওহে! তুমি আর মিছা ভাঁড়াও কেন? এখানে ব্রহ্ম কোথায়? যাঁহার গজবদন নাই, আমি তাঁহাকে ব্রহ্মই বলি না। তুমি ফিরে যাও—ফিরে যাও, বৃথা আমার পাছুপাছু আসিয়া আমাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছ কেন? আমি তোমার সহিত যাব না হে যাব না।

ভট্টের কথা শুনিয়া মুদিরথ আবার বলিলেন,—বিপ্রবর! তুমি তোমার মতিভ্রম ছাড়। এই,—এই দেখ, সাক্ষাৎ দারুব্রহ্ম শুভ বিজয় করিয়াছেন। তুমি আমার সহিত আসিয়া

একবার নিশ্চল নয়নে চাহিয়া দেখ দেখি, নিশ্চয়ই গজানন দেখিতে পাইবে।

মুদিরথের এই কথা শুনিয়া ভট্টের ক্রোধ অন্তর্হিত হইল। আনন্দভরে তাঁহার হৃদয় পরিপূরিত হইয়া উঠিল। তিনি মহানন্দে মুদিরথের সহিত ফিরিয়া চলিলেন। মুদিরথ তাঁহাকে দারুব্রহ্মের সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! দেখ দেখি, একবার ভাল করিয়া—প্রাণ মন এক করিয়া নিশ্চল নয়নে দেখ দেখি, ইনিই তোমার সেই সর্ব্বসন্তাপহারী গজবদনধারী শ্রীহরি কি না?

মুদিরথের কথায় ভট্ট আপন চঞ্চল মন স্থির করিলেন। মন স্থির হইবামাত্রই তাঁহার সাত্ত্বিক দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি তখন নিশ্চল দিব্য নয়নে দেখিলেন। কি দেখিলেন? দেখিলেন,—

"দেখিলা প্রভু ভগবান। হোই অচ্ছন্তি গজানন॥
লম্বি অচ্ছন্তি থোরহস্ত। শোভা দিশই একদন্ত॥"

অহো! প্রভু ভগবান্ গজানন হইয়া আছেন, তাঁহার শুণ্ড লম্বমান হইয়া দুলিতেছে, আর একটি দন্ত শোভা পাইতেছে।

ভট্টের দেখা আর ফুরায় না। তিনি অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রাণারাম গণপতি-মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন,—কেবল দেখিতেই লাগিলেন। দেখিতেদেখিতে ভট্ট আরও যাহা দেখিলেন, তাহা অতীব অপূর্ব্ব! ভট্ট আরও কি দেখিলেন? দেখিলেন,—

"অদ্ভুত বিশ্বরূপ ধরি। ভৃত্যাকু ডাকুচ্ছন্তি হরি॥"

অহো! যিনি ইন্দ্রিয় মনের অগোচর, সেই সুদুর্লভ ভগ-বান্ অপরূপ বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া অমিয়মাখানো স্বরে ভক্ত ভট্টকে আপন সমীপে আহ্বান করিতেছেন,—আয় আয় ভট্ট! আমার কাছে আয় কাছে আয়, আহা বাছা, আমার জন্য তুই কতই না ক্লেশ পাইয়াছিস্, কতই না যাতনা সহিয়াছিস্; আয় আয় বাছা! আমার কাছে আয় কাছে আয়, আমার হৃদয়ের ধন! হৃদয়ে আয়, আয় আয় বাছা! তোর অনন্ত দুঃখের অবসান হইয়া যাউক,—নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হউক।

তখন ভট্ট করিলেন কি?—

"তাহা শুনিল মহামতি। বোলে—নমস্তে গণপতি॥
নমো নমস্তে গজানন। নমস্তে কপিলবদন॥
নমস্তে দারুব্রহ্মবাসী। নমো নমস্তে বিশ্ববাসী॥
তব দর্শনে দারুব্রহ্ম। টুটিলা মোর মতিভ্রম॥
লভিলি পরম কারণ।"

তিনি ভাবগদ্গদকণ্ঠে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। বলিলেন—ওহে গণপতি তোমায় নমস্কার নমস্কার; ওহে গজানন তোমায় নমস্কার নমস্কার; ওহে কপিলবদন তোমায় নমস্কার নমস্কার; ওহে দারুব্রহ্ম তোমায় নমস্কার নমস্কার; ওহে বিশ্বরূপ তোমায় নমস্কার নমস্কার। দারুব্রহ্ম হে, তোমায় দর্শনে আমার মতিভ্রম দূর হইয়া গেল। আমি এতদিনে পরমকারণ তোমাকে পাইয়া পূর্ণকাম হইলাম। দয়াময়, জানিতাম না যে, দীনহীন জীবে তোমার এত দয়া। জানিতাম না হরি, তুমি কল্পতরুর মত যে যাহা বাঞ্ছা করে, তাহাকে তাহাই অকাতরে বিতরণ

করিয়া থাক। জানিতাম না বিশ্বরূপ, সকল রূপই তোমাতে সতত বর্ত্তমান ;—যে যে-রূপে তোমায় দেখিতে চায়, তুমি তাহাকে সেই রূপেই দর্শন দিয়া থাক। তুমি আজ দয়া করিয়া জানাইলে বলিয়াই তো জানিতে পারিলাম। নাথ! তোমার তত্ত্ব তুমিই জান, আর যাহাকে দয়া করিয়া জানাও, সে-ই জানিতে পারে ; অন্যে তো পারে না। তাই কাতরে প্রার্থনা করি,—দয়াময়, যতদিন তোমার এই স্নানযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, ততদিনই তোমায় ভক্তবৎসল-নামের সাক্ষিস্বরূপ—বাঞ্ছাকল্পতরু-নামের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ এই গণেশ-বেশ অঙ্গীকার করিতে হইবে। নাথ! যুগে যুগে তোমার এই অনুপম মহিমা উদ্‌ঘোষিত হইতে থাকুক।

ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন সহাস্যবদনে ভট্টকে বলিলেন—"তথাস্তু"। ভট্টও পরমানন্দে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন, উঠিয়া অঞ্জলিবদ্ধ করযুগল মস্তকে ধারণ করিলেন, হৃদয়ে ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান করিতেকরিতে অচঞ্চলভাবে অবস্থান করিলেন। সকলে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন—ভট্টের দেহ হইতে দিব্য জ্যোতি নিঃসৃত হইয়া বিদ্যুতের মত যাইয়া ব্রহ্মশরীরে মিশ্রিত হইয়া গেল,—ভট্টের প্রাণপাখীও দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল। সকলে জয়জয়-নাদে দশদিক্ মুখরিত করিয়া তুলিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দময় হরিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আনন্দের বুঝি আর তুলনা হয় না।

জয় ভক্তের জয়। জয় ভক্তবৎসল ভগবানের জয়। ভক্ত তুমি ধন্য। কেননা তুমি ভগবান্‌কে আপন অধীন করিতে

পার। আর ভগবান্ তুমিও ধন্য। কেন না তুমিও জাতি-কুল-বিদ্যা-সম্পদ প্রভৃতির অপেক্ষা না রাখিয়া ভক্ত মাত্রকেই আত্মসাৎ করিয়া থাক। তাই ব্রহ্মাদি-বন্দিত তুমি অদ্যাবধি শ্রীনীলাচল-ধামে স্নানযাত্রার দিন ভক্তপ্রার্থিত গণপতি-বেশ বা হস্তিবেশ অঙ্গীকার করিয়া থাক। প্রভু, তোমার জয় হউক—জয় হউক।

কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

"এণু সে সংসার মধ্যেন। প্রভুভকত বড় জন॥
ভক্তঙ্কু ন করিব সান। ভক্ত দ্বিতীয় ভগবান॥"

এই সংসার মধ্যে ভগবানের ভক্তই বড়। ভক্তকে কেহ কখনও ছোট বলিয়া মনে করিও না। ভক্ত—ভগবানের অভিন্ন তনু—ভক্ত দ্বিতীয় ভগবান্। ভগবন্! তোমার ভক্তের জয় হউক—জয় হউক।

বলরামদাসের রথযাত্রা।

বলরাম দাসের নিবাস শ্রীপুরুষোত্তম ধাম। তিনি মহান্ত সোমনাথের শিষ্য। ভক্তমণ্ডলীতে তাঁহার বড়ই খ্যাতিপ্রতিপত্তি। ভিক্ষাই তাঁহার জীবিকা। ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভগবানে সমর্পণ করিয়া,—সেই নিবেদিত অন্ন ভোজনান্তে তিনি সপরিবারে পরমানন্দেই দিনযাপন করেন। কোন দুঃখ নাই—চিন্তা নাই। চিন্তার মধ্যে তিনি কেবল চিন্তামণির চরণ-চিন্তাই করিয়া থাকেন। সেই আনন্দেই তিনি সতত বিভোর। যদি কাহারও মুখে তিনি একবার ভগবানের নাম শুনিতে পান, তবে মনে করেন, যেন কোটি নিধি হস্তগত হইল। হরিকথা শ্রবণ—হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া, হরি-প্রেমে মজিয়া থাকিতেই তিনি প্রাণে-প্রাণে ভালবাসেন। সাধুসজ্জনের সঙ্গেই তাঁহার সর্ব্বদা বসবাস। সকল জীবেই তাঁহার সমান দয়া। শ্রীনীলাচলনাথ দারুব্রহ্ম জগন্নাথের সেবা ব্যতীত তিনি আর কিছুই জানেন না, তাহাই তাঁহার জীবনব্রত। গুণ তো এত, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কি-যে কর্ম্মফল বলা যায় না, চন্দ্রে কলঙ্কের মত তাঁহার একটি মহান্ দোষও ছিল। তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় যখন-তখন বেশ্যাভবনে গমন করিতেন।

এইরূপে কিছুদিন যায়। আষাঢ় মাস, জগবন্ধুর গুণ্ডিচা-যাত্রা (রথযাত্রা) উপস্থিত। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর

তিনখানি রথ প্রস্তুত। বলরাম 'তালধ্বজ' রথে, সুভদ্রা দেবী 'বিজয়া' রথে এবং জগন্নাথ 'নন্দিঘোষ' রথে আরোহণ করিলেন। বিশ্ববাসী সকলকেই কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত তিনজনে শ্রীগুণ্ডিচা অভিমুখে শুভযাত্রা করিলেন। লক্ষলক্ষ লোক আনন্দ-কোলাহলে—জয়জয় হরিহরি রোলে চারিদিক্ মুখরিত করিয়া তুলিল। বিবিধ বাদ্যের আরাব, সংকীর্ত্তনের উচ্চ-নিনাদ এবং সর্ব্বোপরি নন্দিঘোষ-রথের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন সেই ধ্বনির সহিত মিশিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ধরণীতে বুঝি আনন্দ আর ধরে না।

এই আনন্দমহোৎসবে পুরীবাসী প্রায় সকলেই আসিয়া যোগদান করিয়াছেন। আসিতে পারেন নাই অতি অল্প লোকই। যাঁহারা আসিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত, বলরাম দাস তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি তখন বেশ্যাগৃহে আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত; আজিকার এ মহোৎসবের কথা তাঁহার একটুও মনে নাই। হঠাৎ সেই আনন্দময় উচ্চ-ধ্বনিতে তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তখনই তিনি মাথায় হাত চাপড়াইয়া আপনাকে শতশত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন,—

"বোইলে—ধিক্ মো জীবন। অজ্ঞানে বঞ্চিলি মুঁ দিন॥
প্রভু মো রথে বিজে কলে। শোই মুঁ অছি বেশ্যাকুলে॥"

হায় হায়! আমার জীবনে ধিক্, জীবনে ধিক্! আমি অজ্ঞানে অন্ধ হইয়া দিনযাপন করিলাম। প্রভু জগন্নাথ রথযাত্রায় বাহির হইয়াছেন, আর আমি কিনা বেশ্যা সঙ্গে শয়ন করিয়া রহিয়াছি? হায় হায়! আমার জীবনে ধিক্! জীবনে ধিক্!

সেই অপ্রাকৃত ভূমানন্দের প্রবল আকর্ষণের সমীপে পার্থিব ক্ষীণ ক্ষণিকানন্দ পরাভব স্বীকার করিল। বেশ্যার প্রতারণাময় প্রেমের ফাঁস আর বলরামকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি ধ্বনি শুনিয়াই উন্মত্তের মত উধাও হইয়া ছুটিলেন,—চক্ষুর পলক না পড়িতে-পড়িতে রথের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আসিয়া দেখিলেন কি? দেখিলেন,—তাঁহার প্রেমময় পরাণ-বঁধুয়া রথোপরি বিরাজ করিতেছেন। দেখিয়া বলরাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি তিনি এক লম্ফে নন্দিঘোষ রথের উপরে যাইয়া উঠিলেন। অঞ্জলিবদ্ধ করযুগল মাথার উপর রাখি-লেন। নির্নিমেষ নয়নে আনন্দময়ের বদন হেরিতে থাকিলেন; আর বিনাইয়া-বিনাইয়া কত কি বলিতে লাগিলেন।

জগন্নাথের সেবকবৃন্দ কিন্তু বলরামকে দেখিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। কর্কশস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

“গণ্ডে তো তাম্বুলর গার। কুঙ্কুমে দেহ জরজর ॥
অতি কদর্য্য তোর কায়ে। দিশুছি খণ্ড চিত্র প্রায়ে ॥
স্নান শউচ তোর নাহি। থিলু তু বেশ্যাঘরে শোই ॥
কিপাঁ তু চঢ়িলু রথর। ভগতপণ পোড়ু তোর ॥
কে তোতে বোলে জ্ঞানবন্ত। দেখ হে প্রভু জগন্নাথ ॥
ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি যার পাদে। সেবা করন্তি অপ্রমাদে ॥
তাহাঙ্কু তোর ভয় নাহিঁ। আসিচ্ছু শুচিবন্ত নোহি ॥”

আরে, তোর গালে পানের পিচ লাগিয়া রহিয়াছে। কুঙ্কুম-রাগে দেহ ভরিয়া গিয়াছে। তোর শরীর অতি অপবিত্র; ঠিক যেন একখণ্ড ছবির মত দেখাইতেছে। তোর স্নান করা নাই,

শুদ্ধাচার নাই; বেশ্যার ঘরে তুই শুইয়াছিলি। আর সেই অবস্থায় তুই রথের উপর আসিয়া চড়িলি কি বোলে? তোর ভক্তপণার মুখে আগুন, মুখে আগুন;—তোর ভক্তপণা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাউক। তোকে জ্ঞানবন্তই বা বলে কে? আহা প্রভু জগন্নাথ;—ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি দেবগণ অতি সন্তর্পণে সাবধানে যাঁহার চরণসেবা করিয়া থাকেন, তোর তাঁকে একটু ভয় নাই; অশুচি অবস্থাতেই কিনা তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিস্?

এইরূপে সেবকগণ যাঁহার মনে যাহা আসিল, গালি দিতে-দিতে এবং গলাধাক্কার উপর গলাধাক্কা দিতে-দিতে বলরামকে রথের উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। ফেলিয়া দিয়াও সেবকগণের ক্রোধের বিরাম নাই, তখনও তাঁহারা অজস্রধারে বলরামের উপর দুর্ব্বাক্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শেষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া দিলেন,—"যারে যা, তোর বাপের কাছে যা; এই কথা তোর বাপের কাছে গিয়া বল।"

সেবকবৃন্দের কাছে এইরূপে তিরস্কৃত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া বলরাম মরমে মরিয়া গেলেন, দুঃখ-সন্তাপে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তিনি অভিমানভরে ভক্তের যিনি মাতা-পিতা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলই—সেই জগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দূরে রহিয়াই একবার চাঁদবদন ভাল করিয়া দেখিলেন। অমনি তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। তিনি ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার প্রাণবন্ধুর উদ্দেশে একটি

প্রণাম করিলেন। আবার উঠিয়া কপালে করযুগল স্থাপন করিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"ওহে চক্রপাণি! তোমায় নমস্কার। ওহে জলদবরণ পদ্মবদন! তোমায় নমস্কার। ওহে মহাবাহু! ভক্ত তোমায় যে সাজে সাজায়, তুমি সেই সাজেই সাজিয়া থাক, ভক্তের লজ্জা তুমিই নিবারণ করিয়া থাক, তাই তুমি ভক্তবৎসল, তোমায় নমস্কার। তোমার অপার মহিমা!—তুমি যুগল-করে শঙ্খ-চক্র ধারণ করিয়া ঐ যে নন্দিঘোষ রথে বিরাজ করিতেছ; ঐ রথের উপর থাকিয়া-থাকিয়াই তুমি তিন-পুরে বিরাজমান রহিয়াছ। তুমি পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন। তোমাব তেজ তেজোরাশি সূর্য্যকেও গঞ্জনা দিতেছে। তোমার শক্তিসামর্থ্যের তো কিছুই অভাব নাই। তবে তুমি স্বয়ং আমার মুণ্ডচ্ছেদন না করিয়া পরহস্তে দণ্ড দিলে কি নিমিত্ত? ইহাতে তোমার যশই বা বাড়িয়া গেল কত? আমার এতদিন ধারণা ছিল যে, আমার প্রতি তোমার অপার করুণা; এইবার সেই করুণার পরিমাণ বেশ বুঝা গেল—বুঝা গেল!"

এই সকল কথা বলিতে-বলিতে অভিমানের প্রবল আবেগে বলরাম দাস তাঁহার প্রভুকে দুইটা কটুকথাও কহিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"ওহে তুমি আমাকে তোমার সেবক হাথাইয়া দণ্ড দেবে বই কি—দেবে বই কি! তুমি হ'লে নন্দঘোষের বেটা, আর আজ একবারে নন্দিঘোষ রথে চড়িয়া অমূল্য আসনে উপবেশন করিয়া আছ; আমাদের মত অধম জন কি এখন আর তোমার মনে পড়িতে পারে? ওহে তুমি আর আমাদের দিকে তাকাইয়া দেখিবে কেন—দেখিবে কেন? আমি তোমায় প্রাণবন্ধু বলিয়াই জানিতাম,

তাই তোমার কাছে আসিয়াওছিলাম। তাই ব'লে কি এত দণ্ড দিতে হয়? সে যাহা হউক, আজ তোমায় উত্তমরূপেই চেনা গেল—চেনা গেল।"

দুইটা কটুকথা বলিয়াও বলরাম ক্ষান্ত নহেন। তিনি তাঁহার প্রভুদত্ত দণ্ডের উপযুক্ত প্রতিদণ্ড বিধানে অগ্রসর হইলেন। প্রণয়-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমি তোমায় উত্তমরূপেই শিক্ষা দিতেছি। তোমার নাড়ী-নক্ষত্র সকলই তো আমি জানি। এইবার তোমার আক্কেল হইবে। এই আমি ফিরিয়া চলিলাম; দেখি তোমার রথের দড়িই বা টানে কে, আর তোমার রথযাত্রাই বা কেমন করিয়া হয়? তোমার বাপ নন্দের দিব্য দিয়া বলি, এই-বার রথটাই বা চালায় কে, একবার আমি দেখে নিই।"

দীনতাই ভক্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ভক্ত প্রণয়কোপে যতই অভিভূত হউন না কেন,—আর সেই অভিমানভরে ভগবানকে যতই কটুকাটব্য বলুন না কেন, সে অভিমান হৃদয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না; ভক্তের স্বাভাবিক দৈন্য আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে;—দীনতার আবরণে সেই অভিমান ঢাকা পড়িয়া যায়।

বলরাম দাস অভিমানে আত্মহারা হইয়াছেন সত্য, আর অভিমানভরে প্রাণবন্ধুকে কত কি কটু কথা বলিয়াছেন, তাহাও সত্য, অধিক কি অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহাও সত্য; কিন্তু হইলে কি হয়, ভক্তস্বভাবসুলভ দীনতা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল। তিনি তাঁহার প্রাণবন্ধুর উদ্দেশে দীনহীন কাঙালের মত বলিয়া উঠিলেন—"ওহে

শ্রীবৎসলাঞ্ছন! তুমি আমার আর একটা কথা শোন।—তুমিই আমার একমাত্র শরণ। আমি তোমার সেবক। তুমি আমার প্রাণের নায়ক। যদি আমার অন্য শরণ থাকে, তাহা অন্যে বুঝুক আর না-ই বুঝুক, সর্ব্বান্তর্যামী তুমি তো তাহা ভালরূপেই বুঝিতে পারিবে। ওহে পূতনাপ্রাণ-নাশন! তোমাকে আর একটা কথা—বেশী নয় আর একটা কথা বলিয়া বিদায় লই। শুনিবে না কি? বলি, এই যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, সেই ব্রহ্মাণ্ডে সেবকের প্রভু কি একটি বই আর দুইটি আছে? সেবকের যদি এক বই দুই প্রভু না রহিল, আর সেই সেবকের ক্ষতিবৃদ্ধি যদি সেই প্রভু না-ই বুঝিল, তবে লজ্জা হইবে কাহার? এই কথাটা তুমি হৃদয়ে বিচার করিয়া দেখ। তোমাকে অধিক আর কি বলিব, তুমিই আমার জীবিতেশ্বর;—অন্য কেহ নয়।"

এই বলিয়া অভিমানভরে বলরাম দাস তথা হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় যতদূর দৃষ্টি চলে—পাছু-পাছু চাহিতে-চাহিতেই চলিয়া চলিলেন। এইরূপ চলিতে-চলিতে তিনি সিন্ধুতীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সমুদ্রতীরে চক্রতীর্থ। বাঁকিমুহানা তাহারই পাশাপাশি। চারিদিকেই বালুকারাশি বলরামের প্রাণের মতই ধূধূ করিতেছে। এত দৈন্যনিবেদন করিলাম, আসিবার সময় এত ফিরিয়া-ফিরিয়া থমকিয়া-থমকিয়া চলি-চলি করিয়া চলিয়া আসিলাম; কিন্তু কই আমার প্রাণবল্লভ তো আমাকে একটি আশ্বাসের বাণী বলিলেন না; আমাকে ফিরাইবার জন্য তো কোন চেষ্টা-চরিত্রও করিলেন না;—এই বিষাদে বলরামের হৃদয় ভরিয়া গেল। তিনি

বিষণ্নমনে বাঁকিমুহানার সেই বালুকাকীর্ণ প্রান্তরে যাইয়া উপবেশন করিলেন। প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি আবার তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিল। তিনি তাহারই ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

বলরাম করিলেন কি? তিনি তাড়াতাড়ি বালুকার তিনখানি রথ তৈয়ারি করিলেন। তাহার পর নয়ন মুদিয়া জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানযোগে তাঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বলিলেন,—"প্রভু হে, আমাকে যদি সেবক বলিয়া মনে হয়, তবে আর বিলম্ব করিও না; এই রথে শুভ বিজয় কর।"

এই কথা বলিতে-বলিতে বলরাম ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা গলিয়া পড়িতে লাগিল। সেই ধারা অমৃতনদীর মত তাঁহার সর্ব্বশরীর ভাসাইয়া দিতে থাকিল। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদিমূল জগন্নাথ তাহা জানিলেন। জানিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। থাকেনই বা কি প্রকারে? যে প্রভু ভক্তবৎসল, যিনি শরণাগতের রক্ষাকর্ত্তা এবং সেবকের সামান্য বেদনাও যিনি সহিতে পারেন না, সেবকের এত দুঃখ-বিষাদ দেখিয়াও কি আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তৎক্ষণাৎ তথাকার সুখসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতা ও ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া বাঁকিমুহানে ভক্ত বলরামের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বালির রথে শুভবিজয় করিলেন। তথাকার রথে কেবল দারুই পড়িয়া রহিল।

বলরাম দাস ধ্যানযোগে তাহা দেখিলেন। হর্ষভরে তাঁহার

হৃদয় ভরিয়া গেল। তিনি তখন অল্পেঅল্পে নয়ন মেলিয়া দেখিলেন। তাঁহার কোটিকল্পকৃত সুকৃতির ফললাভ হইয়া গেল। তবুও তাঁহার অভিমানের অন্ত নাই; তিনি বক্রনয়নে চক্রধারীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ; কিন্তু বাহিরে দুঃখের অভিনয়। পদ্মমুখ ভগবান্ তাহা জানিলেন। পীতবাস হাসিয়াহাসিয়া দাসের প্রতি কহিতে লাগিলেন,—"বলরাম! তুমি আমার উপর রাগ করিও না। দেখ, আমি তোমার ঘোরতর সন্তাপ দেখিয়াই তথাকার যাত্রা উপেক্ষা করিয়া তোমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখন আমি তোমারই আয়ত্ত। তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার।"

প্রভুর শ্রীমুখের এই অমৃতময় কথা শুনিয়া দাসের হৃদয়ের অভিমান দূর হইয়া গেল; তখনই তিনি মস্তকের উপর অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুইটি স্থাপন করিলেন; প্রভুর চরণতলে পড়িয়া আহি—চিন্তা করিয়া তাঁহার সম্মুখেই শুইয়া পড়িলেন। উঠিয়া আবার কপালে কৃতাঞ্জলিপুট করযুগল বিন্যস্ত করিয়া গদ্গদরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"ওহে চক্রধারি তোমায় নমস্কার। কমলা তোমার পরিচারিকা। বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা আজ্ঞাকারী। তোমারই আজ্ঞায় দেবরাজ ইন্দ্র, সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সূর্য্য, চন্দ্র, হুতাশন, নাগ, নৃপতি, চরাচর, পৃথিবী, আকাশ, দিক্পাল, সকলেই যাতায়াত করিতেছেন; তুমি সকল লোকের নাথ। সরস্বতী তোমার আজ্ঞাকারিণী। অষ্টনিধি তোমার পরিবার। সিদ্ধ যোগীন্দ্রমুনিগণ ধ্যানে তোমার চরণ চিন্তা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাছে এ

কীটাণুকীট ছার আমি আর কতটুকু; কেবল তোমার কাছে দাসখৎ লিখাইয়াছি বলিয়াই তো তুমি, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমার কাছে আসিয়াছ,—সহস্রসহস্র লোকের সেবা, সুরপ্রার্থনীয় সেবাসম্ভার, বহুমূল্য সুকোমল আসন, গীতবাদ্য নর্ত্তন প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া এই উত্তপ্ত অনাবৃত বালুকাকীর্ণ ভূমিতে বাল্লুর রথে আসিয়া শুভ-বিজয় করিয়াছ! ধন্য ধন্য প্রভু; তোমার প্রভুপণার বলিহারি যাই—বলিহারি যাই! অহো! মূঢ় মানব তোমার এ করুণার কথা—সেবকের সন্তাপমোচনের কথা কিছুই জানে না, তাই তাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করিতে যায়। তাহারা যেন ঠিক—

"গঙ্গা তেজিণ গঙ্গাকূলে। কূপ খোলন্তি তৃষাতুরে ॥
সুধা তেজিণ বিষ খাই। মরিবা সম সে অটই ॥"

পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া গঙ্গা তেজিয়া গঙ্গাকূলে কূপ-খনন করে; সুধা তেজিয়া বিষ ভক্ষণ করিয়া মর-মর হইয়া পড়ে।

কিন্তু নাথ, যে তোমার কিঞ্চিৎ মহিমা অবগত হইয়া অবিরত তোমার ভজনা করে,—তোমার চরণে শরণ গ্রহণ করে, সে ইন্দ্রাদি-পদকেও গণনার মধ্যে আনে না, তোমার বলে বলী হইয়া সংসারে আর কাহাকেও ভয় করে না। সর্ব্বদাই মনে করে,—শঙ্খ-চক্র গদা-পাণি যখন আমার সহায় আছেন, তখন আর ভাবনা কিসের?

প্রভু, আমি তোমার কাছে সর্ব্বদাই অপরাধী। কিন্তু তুমিও যে করুণার সাগর। সে অনন্ত অপার সাগরে সকল অপরাধই তৃণখণ্ডের মত কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায়। সেই

সাহসেই প্রভু, আমি তোমায় আজ যত কিছু অকথা-কুকথা বলিয়াছি। তাহার সমুচিত শাস্তি হউক—আমার জিহ্বায় বজ্রাঘাত হউক।

নাথ, তুমি যে ভৃত্যের এত সহায়—এত পক্ষ, এতদিন তাহা কেবল ভাসা-ভাসা জানা ছিল, আজ কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা গেল। প্রভু, আজ নীলাদ্রি-নগরে তোমার রথযাত্রার মহোৎসব। আজ সেখানে তোমার সুখভোগের আর সীমা-পরিসীমা নাই। কিন্তু তুমি কি-না আজ সেই নীলাদ্রি-নগর ছাড়িয়া, নন্দিঘোষ-রথ পরিত্যাগ করিয়া, অশেষ সুখভোগ উপেক্ষিয়া, ভ্রাতা ও ভগিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাঙাল আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। এখানে কি ভোগ উপভোগ করিবে প্রভু? মূঢ় আমি বড়ই মন্দ কর্ম্ম করিয়াছি;—আহা আমিই প্রভুকে এই মহাকষ্টে ফেলিয়া দিয়াছি। আমার গতি কি হবে প্রভু?"

ভাবগ্রাহী ভগবান্ ভক্তের আত্মনিবেদন শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন। প্রীতিভরে ভৃত্যকে আপনার পার্শ্বে বসাইলেন। মৃদু-মধুর হাস্য করিতে-করিতে শ্রীমুখে আদেশ করিলেন,— "বলরাম, প্রাণপ্রিয় বলরাম! বল দেখি, নীলাদ্রি-নগরে আজ আমার উৎসব হয় কি প্রকারে? ভক্তের ভাবই আমার মূল। ভক্ত ভাবমূল্যে আমায় কিনিয়া লয়। তুমি তো আমাকে সেখানকার অনেক সুখের কথা বলিয়া ফেলিলে, কিন্তু—

"অশেষ সুখভাব মোর। ভগত-কথামৃত সার॥
মোর মহিমা পদে পদে। যে গুণু থিব সদা হৃদে॥

সে অটে সুখদাতা মোর। মুঁথাই অগ্রতে তাহার ॥
এ কথা সত্য সত্য মোর। তো মনে সংশয় ন কর ॥”

ভক্তের কথামৃতই আমার সকল সুখসম্পত্তি। যে জন হৃদয়ে আমার মহিমা পদে-পদে চিন্তা করিয়া থাকে, সে-ই আমার সুখদাতা। আমি তাহারই অগ্রভাগে সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকি। আমার এ কথা সত্য সত্য; তুমি মনোমধ্যে সংশয় করিও না।”

প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিয়া বলরাম দাস পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। বালির রথে আর প্রাণনায়ককে বসাইয়া রাখিতে তাঁহার ক্লেশবোধ হইতে লাগিল। তিনি তখন আপন দেহরথেই আর এক নূতনতর রথযাত্রা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি তখন হৃদয়মধ্যে চক্রাসনে যতন করিয়া প্রভুকে বসাইলেন। আপন ধৈর্য্যস্তম্ভে মনোরূপ পট্টডোরি দিয়া প্রভুকে বাঁধিলেন। আনন্দ দাণ্ডে (বড়রাস্তায়) রথ রাখিলেন। তাহাতে কল্পনারজ্জু বন্ধন করিলেন। তাঁহার প্রকৃতিরূপ কলাপিঠিয়াগণ (গোপজাতি বিশেষ) আসিয়া রথরজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিল। রথোপরি সুগুণ-সারথী রঙ্গভরে নাচিতে-গাইতে রথ চালাইতে লাগিল। রাজস-বুদ্ধি ছড়িদার হইয়া হস্তে বেত্র ধারণপূর্ব্বক হিংসা দুর্বুদ্ধি প্রভৃতিকে তাড়াইতে থাকিল। মহত্তত্ত্ব ঘোর ঘণ্টানাদ করিল। শব্দতত্ত্ব শঙ্খ বাজাইয়া দিল। জাগ্রত পুরুষ পড়িছা-(পণ্ডা-বিশেষ)-রূপে রথ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পঞ্চপ্রাণ ব্রাহ্মণ-রূপে সুবুদ্ধিপণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর পূজায় বসিয়া গেলেন।

চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে যেখানে যত অপূর্ব্ব সামগ্রী পাওয়া যায়, প্রভুর সম্মুখে সমস্তই একত্রিত করা হইল। পূজা করিয়া প্রভুর ভোগ দেওয়াও হইয়া গেল। নৃপতি মন চৈতন্য-মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সুষুম্নাদ্বারে বিরাট্ পুরুষের সম্মুখে অবস্থান করিলেন। আজ্ঞা দিলেন,—ভয়কে মার, আর ক্রোধ, তামস ভাব, কুটিলতা, কপটতা, কুমতি, মিথ্যা, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, দুর্গুণ, দাম্ভিকতা ও কল্পনা আদি যত লোক,—সকলকে এ দিব্যরথে থাকিতে দিও না, সকলকে মারিয়া দূর করিয়া দাও। মন-নৃপতি এই প্রকার হুকুম দিয়াই প্রভুর শ্রীমুখ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এই অদ্ভুত অপূর্ব্ব রথযাত্রার অবতারণা করিয়া বলরাম দাসের আনন্দ আর ধরে না। তাঁহার আর সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি কিংবা দেহগেহ, কিছুরই আশা নাই; রাত্রিদিবস জ্ঞান নাই;—ক্ষুধাতৃষ্ণাও নাই। কেবল একমনে একপ্রাণে এবং একই ভাবে তিনি দারুব্রহ্মকে ভজনা করিতে লাগিলেন। ভক্তের এই বিশুদ্ধ ভাব দেখিয়া শ্রীহরিও সেই ভাববন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গেলেন।

এদিকে নীলাচলনগরে বিষম ব্যাপার বাধিয়া গিয়াছে। অসংখ্য কলাপিঠিয়া নন্দিঘোষ প্রভৃতি রথের দড়ি ধরিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতেছে, কিন্তু রথ চলা দূরে থাকুক, রথের চাকাও একটু নড়িতেছে না। দেখিয়া শুনিয়া সকলেই অবাক্। সকলেই ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির,—রথ চালাইবার কি বুদ্ধিই বা করা যায়, আর রথই বা চলে না কেন?

কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া সকলে নৃপতির অগ্রে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং রথের বৃত্তান্ত সমস্তই কীর্ত্তন করিলেন। রাজা শুনিয়া পরম বিস্মিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজ্যের চারিদিকেই ঢেঁড়া পিটাইয়া দিলেন; আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কিংবা স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ যে যেখানে আছ, সকলে সত্বর আসিয়া রথ-রজ্জু আকর্ষণ কর।

রাজার আদেশে তখনই দেশেদেশে লোক ছুটিল এবং ঢেড়া পিটিয়া রাজার আদেশ জাহির করিতে লাগিল। রাজার আদেশ পাইয়া দেখিতেদেখিতে সহস্রসহস্র লক্ষলক্ষ লোক আসিয়া পুরী-ধাম পূর্ণ করিয়া ফেলিল। সকলেই প্রবলপরাক্রমে রথের রজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু যেখানকার রথ, সেইখানেই রহিয়া গেল। সকলের সমবেত শক্তি রথকে এক চুলও সরাইতে পারিল না।

ব্যাপার দেখিয়া নরনাথ অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মনে-মনে বলিলেন,—হায়! না জানি আমার কি অভাগ্যের উদয় হইল, তাই আজ শত চেষ্টাতেও রথ চলিতেছে না। মনের দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া নৃপতি তখন আদেশ করিলেন,—"ওহে রাজ্যে যেখানে, যত মত্তমাতঙ্গ আছে, সত্বর লইয়া আইস।" রাজার এ আদেশও প্রতি-পালিত হইল। চারিদিক্ হইতে শতশত মদমত্ত হস্তী আনয়ন করা হইল। রাজার আদেশে সেই সকল হস্তী সুসজ্জিত করিয়া রথে সংযোজিত করা হইল। মাহুতগণ ঘনঘন অঙ্কুশের তাড়না করিতে লাগিল। এদিকে স্বয়ং প্রতাপরুদ্র রাজা জগন্নাথের নানামতে পূজা

করাইয়া কোমরে কাপড় কষিয়া রথরজ্জু ধারণ করিলেন। রাজা নিজে আসিয়া রথের দড়ি ধরিয়াছেন, দেখিয়া চারিদিকের লোক আসিয়া মহাব্যগ্রতার সহিত নন্দিঘোষ রথখানিকে 'গুড়কে পিঁপড়ার মত' ঘিরিয়া ফেলিল। চারিদিক্ হইতে উলুউলু ধ্বনি চটপট করতালি ধ্বনি এবং হরিবোল ধ্বনির ধূম পড়িয়া গেল। সে আনন্দ-উল্লাস দেখে কে? সকলে রথের দড়ি ধরিয়া যথাশক্তি টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু রথ কিছুতেই চলিল না। রাজা ও অন্যান্য সকল লোকই প্রাণান্তপরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং যে যেখানে পাইলেন, যাইয়া বসিয়া পড়িলেন।

তখন মহারাজ মনেমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি নিশ্চয়ই প্রভুর পাদপদ্মে অনেক অপরাধ করিয়াছি। তাই রথ কিছুতেই চলিতেছে না। সে যাহা হউক, ব্যাপারখানা কি, একবার বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে। এই বলিয়া রাজা দুঃখিতমনে কুশাসনে শয়ন করিয়া রহিলেন। মনের সন্দেহ মিটাইবার আর অন্য উপায় নাই দেখিয়া, সেই প্রভুর পাদপদ্মেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন।

অন্তর্য্যামী নারায়ণ তখনই তাহা জানিতে পারিলেন। স্বপ্নচ্ছলে রাজাকে কহিলেন,—"রাজন্! তুমি চিন্তা করিতেছ কেন? আমি তোমাকে যাহা যাহা বলি, তাহা শুদ্ধচিত্তে শ্রবণ কর।—

"মোর ভগত যেউ জন। মো নাম করই গায়ন॥
সে কেবে অশুচি নুহই। সর্ব্বদা শুচিবন্ত দেহী॥"

দেখ, যে ব্যক্তি আমার ভক্ত,—দিনযামিনী আমার নাম-

গান করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকে, সে কখনও অশুচি হয় না; তাহার দেহ, প্রাণ, আত্মা সমস্তই শুচি,—শুচি হইতেও পরম শুচি।

শুচি অশুচি কিংবা পবিত্র অপবিত্র বিচার প্রাকৃত দেহেই সম্ভবে। ভক্তের দেহ অপ্রাকৃত, সুতরাং তাহা নিত্য পবিত্র। শুচি-অশুচি কিম্বা পবিত্র-অপবিত্র বিচার তাহাতে চলিতেই পারে না। নরনাথ! ভক্ত-চরিত্র বড়ই দুর্ব্বোধ।

দেখ মহারাজ, বলরাম দাস আমার প্রিয় ভক্ত। সে মহাহর্ষমনে আমার কাছে আসিয়াছিল। সেবকগণ তাহাকে মারিয়া ধরিয়া, তাড়াইয়া দিল। তাই সে অভিমানবশে চক্রতীর্থে চলিয়া গেল। সে দুঃখমনে বাঁকিমুহানায় যাইয়া বসিল। প্রাণে-প্রাণে আমার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিল। আমি তাহা জানিতে পারিলাম। তৎক্ষণাৎ তাহার পার্শ্বে যাইয়া মিলিত হইলাম। সে আমার যে প্রকার সুখ দিল,—যে প্রকার রথযাত্রা করিল, অন্যের কথা কি, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও তাহা অনুষ্ঠান করা কঠিন। তুমিই বা তাহার ভাব জানিবে কেমনে? তাই আমি সেইখানেই রহিয়াছি। এখানকার রথ চলিবে কি প্রকারে, ভক্ত যে ভাবরজ্জুতে আমায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে; সে বন্ধন তো আর মোচন করিতে পারিতেছি না। এতো দড়ির বাঁধন নয়, যে ফুস্ করিয়া খুলিয়া ফেলিব? ভক্তের ভাবের বাঁধন,—শক্ত বাঁধন! ভক্তের সহিত আমার যে কত ঘনিষ্ঠতা—কত অভিন্ন ভাব, তাহা সকলে জানে না; সে কথাও একটু বলি শুন,—

"ভগত মোহর শরীর। মুহি তাহাঙ্ক প্রাণেশ্বর॥
ভগত মোর ভিন্নাভিন্ন। কেবেহেঁ নুহে হে রাজন॥
ভগত রক্ষণ নিমন্তে। চক্র মুঁ ধরিঅচ্ছি হস্তে॥
ভগত দুঃখ সুখ যেতে। মুঁ সিনা ভুঞ্জুথাই নিত্যে॥"

ভক্ত আমার শরীর। আমি তাহার প্রাণেশ্বর। রাজন্! ভক্তে ও আমাতে কখনও ভিন্নভাব নাই; আমরা চিরদিনই অভিন্ন। আমার হস্তে এই যে চক্র দেখিতেছ, ইহা কাহার নিমিত্ত ধারণ করিয়া আছি? আছি কেবল ভক্তেরই নিমিত্ত,—এই চক্রে ভক্তের বৈরি-নিপাত করিয়া তাহাকে নিরাপদ্ করিবার নিমিত্ত। ভক্তের যত সুখ যত দুঃখ, আমাকেই তো তাহা নিত্য উপভোগ করিতে হয়? ফল, ভক্তের সুখেই আমার সুখ, ভক্তের দুঃখেই আমার দুঃখ। ভক্ত সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ। সে আমার উপর সকল ভার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত আছে। ভাবনা তো যত আমারই। ভক্ত দুঃখ পাইলে যখন সে দুঃখ আমাকেই ভোগ করিতে হইবে, তখন স্বার্থের খাতিরেও তো তাহার দুঃখ দূর করিয়া দেওয়া আমার দরকার। ভক্তের সুখেই আমার সুখ হয় বলিয়া আমি সদাসর্ব্বদা ভক্তের সুখানুসন্ধানই করিয়া থাকি। ভক্তের দুঃখ বিদূরিত করা এবং তাহাকে নিত্য সুখে নিমগ্ন করাই আমার কার্য্য।

রাজন্! যাহা বলিলাম, তাহাতে মনে অণুমাত্র সংশয় করিও না। ইহা বার-পর-নাই সত্য কথা। অতঃপর যাহা বলিতেছি, তাহাও অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। যদি তোমার নন্দিঘোষ রথে আমার যাত্রা করাইবার একান্ত ইচ্ছাই হইয়া থাকে, তবে তুমি এক

কার্য্য কর ;—যাহারা আমার ভক্তকে অকারণ দণ্ড দিয়াছে, সেই সকল সেবককে শীঘ্র ডাকাও; ডাকাইয়া জোড়াজোড়া করিয়া তাহাদের বাঁধাও। তাহাদের গলায় কুড়ুল বাঁধিয়া দিবে; তাহারা দন্তে তৃণগুচ্ছ ধারণ করিবে; তাহাদের পিছন হইতে গলা ধাক্কা দিতে-দিতে আমার ভৃত্য বলরাম দাসের সম্মুখে লইয়া আসিবে; তাহার চরণতলে সকলে লুটাপুটি খাইতে থাকিবে; আর তুমিও স্বয়ং বলরাম দাসকে কোলে বসাইয়া অনেক গৌরব-সম্মান-সহকারে নন্দিঘোষ রথে লইয়া আসিবে; রথের উপর বসাইয়া পরম আদরে তাহার মাথায় পাটশাড়ীর শিরোপা বাঁধিয়া দিবে। এইরূপ পূজা পাইয়া সে যখন বেগে রথ চালাইবার জন্য আদেশ করিবে, তখনই রথ অবাধে চলিতে থাকিবে, নচেৎ কিছুতেই চলিবে না। রাজন্! আমি সত্যসত্যই বলিতেছি,—

"মুহিঁ ছাড়িলি নীলাচল। ভগতভাব মোর মূল॥
ভগত যিব মোর যেণে। মুহিঁ নিশ্চয় বিবি তেণে॥"

ভক্তের বিশুদ্ধ ভাবই আমার যাহা কিছু সকলই। সেই ভক্তের আকর্ষণেই আমি নীলাচল ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছি। ভক্ত আমার যে দিকে গমন করিবে, আমিও নিশ্চয় সেই দিকেই গমন করিব। ভক্ত নীলাচলে চলিলে আমিও তাহার সহিত নীলাচলে চলিয়া যাইব।

এই কথা বলিয়া ভগবান্ অন্তর্ধান করিলেন। নৃপতিও ব্যস্ত-সমস্তভাবে উঠিয়া দাসদৌবারিকাদি সেবকবৃন্দকে ডাকাইলেন, জোড়াজোড়া করিয়া তাহাদের বাঁধাইলেন; সকলের গলদেশে

কুঠার ঝুলাইয়া দিলেন; দন্তে তৃণগুচ্ছ ধারণ করাইলেন এবং পাছু-পাছু গলাধাক্কা দিতে-দিতে ভক্ত বলরাম দাসের সম্মুখে সকলকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই ভক্তের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। উঠিয়া আবার কপালে কৃতাঞ্জলি হস্ত অর্পণ করিলেন। বলিলেন,—দেব! আমরা বড় অপরাধী, অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডও আমরা পাইয়াছি। আর কেন, এইবার আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন; উঠুন—নীলাচলনগরে শুভ বিজয় করুন। ধন্য আপনার ভক্তির মহিমা! অজ্ঞ আমরা তাহা কি প্রকারেই বা বুঝিতে পারিব?

নৃপতিও মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া অনেক আদরগৌরবে বলরাম দাসকে আপনার কোলের উপর বসাইলেন। ধন-রত্ন বসন-ভূষণে তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। অশ্বের উপর আরোহণ করাইয়া মহা মহোৎসব করিতেকরিতে নীলাদ্রিনগরে নন্দিঘোষ রথের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রথের উপর লইয়া গেলেন। প্রভুর সম্মুখে বসাইয়া পাটশাড়ীর শিরোপা তাঁহার মাথায় বাঁধিয়া দিলেন এবং বিনয়ের সহিত বলিলেন,—ভক্তবর! এইবার দয়া করিয়া রথযাত্রা করাও; সকলই তো তোমার আয়ত্ত।

বলরাম দাস রাজার আদর-আপ্যায়নে এবং সুমধুর সম্ভাষণে মনেমনে মহা হর্ষ অনুভব করিলেন। প্রভুর প্রতি প্রেমনেত্রে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"বোইলে—নমো মহাবাহু। ভগতবৎসল বোলাউ॥
নাম করুণামহাসিন্ধু। কিঞ্চিতে ছুব কর দারু॥

এবে মুঁ কহুঅছ্ছি তোতে। ভো প্রভু বিজে কর রথে ॥
তুরিতে রথ চলি যাউ। প্রভুমহিমা রহি থাউ ॥”

ওহে মহাবাহু! তোমায় নমস্কার। তুমি নাকি আপনাকে ‘ভক্ত-বৎসল’ বলাইয়া থাক। তোমার নাম নাকি করুণার মহামেরু। উচ্চতায় মেরুপর্ব্বতের বরং পরিমাণ হয়, কিন্তু তোমার করুণার আর পরিমাণ হয় না ; তাই বুঝি তুমি করুণামহামেরু। তাই তোমার কাছে কিঞ্চিৎ করুণা ভিক্ষা করি,—তোমার দারুবিগ্রহ একটু দুর্ব্বল করিয়া দাও। বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি সংবরণ করিয়া রথে শুভ বিজয় কর। রথও ত্বরিতগতিতে চলিতে থাকুক। ভক্তের প্রভু তুমি,—গতি তুমি, তোমার মহিমা চিরতরে বিশ্ব ভরিয়া রহিয়া যাউক।

ভক্ত বলরাম দাস নৃপতিদত্ত সম্মান-মর্য্যাদা লাভ করিয়া ইতর-জনের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইলেন না, অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিলেন না। আর সেই অহঙ্কারভরে স্বয়ং কোন হুকুমও চালাইলেন না। অধিকন্তু তাঁহার সকল সম্মান সকল মর্য্যাদার মূল সেই প্রভুরই নিকটে করুণা ভিক্ষা করিলেন। ভক্ত ও ভগবান্ একপ্রাণ কিনা, তাই ভক্ত বলরাম প্রাণেপ্রাণে প্রভুর প্রেরণা বুঝিতে পারিলেন। তিনি অতি দীনহীনের মত কৃতাঞ্জলিপুটে সকলের প্রতি বলিয়া উঠিলেন,—আর বিলম্ব নয়, তোমরা এইবার রথরজ্জু আকর্ষণ কর, প্রভুর শুভ বিজয় হইবেই হইবে।

ভক্তের কথা শুনিয়া অমনি কলাপিঠিয়াগণ রথের দড়ি ধরিয়া টান দিল। সকলেই জয়জয়-হরিহরি-ধ্বনি করিতে থাকিল। বিবিধ বাজনা বাজিয়া উঠিল। রমণীগণ হুলাহুলি দিতে লাগিল। সেবকগণের

ঘনঘন ঘণ্টা-কাংস্য-নিনাদ সেই সংমিশ্রিত শব্দকে আরও তুমুল করিয়া তুলিল।

চারিদিকেই এই আনন্দোল্লাস দেখিয়া ভগবান্ নৃপতির প্রতি পরম প্রসন্ন হইলেন এবং ভক্তের মহত্ত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত রথ-যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ঘন ঘোর গর্জ্জনে তালধ্বজ রথ চলিতে লাগিল, সঙ্গেসঙ্গে বিজয়া এবং নন্দিঘোষ রথও চলিতে আরম্ভ করিল। সে রথের দৌড়ই বা দেখে কে? রথের দড়ি কোথায় পিছন দিকে পড়িয়া রহিল, আর পাখীর মত শূন্যমার্গেই যেন রথ তিনখানি উড়িয়া যাইতে লাগিল। পলক না পড়িতে-পড়িতে তিনখানি রথই গুণ্ডিচানগরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল।

এই বিচিত্র ব্যাপার দেখিয়া, স্বয়ং মহারাজ এবং অন্যান্য যত লোক, ভক্ত বলরামের চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া নানাপ্রকার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ভক্ত ও ভগবানের জয়জয়-রবে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। সে দৃশ্য যার-পর-নাই মধুর,—যার পর নাই মর্ম্মস্পর্শী! কেহকেহ ভক্তের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন,—ওহে তোমার জীবন ধন্য; তুমি নারায়ণকে আপনার বশ করিয়া ফেলিয়াছ। আবার কেহকেহ ভগবানের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন,—অহো প্রভু, ধন্য তোমার মহিমা; তুমি ভক্তের গৌরব রক্ষা করিলে। অনন্তর সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

"এণু এ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেন। হরিভগত বড় জন॥
যে সাধুজনঙ্কু ভজন্ত। সে নিশ্চে হরিঙ্কি লভই॥
যে বা সাধুরে দ্রোহ করি। সে নিশ্চে শ্রীহরি-বইরি॥"

এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে হরিভক্তই শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সাধুজনের ভজনা করে, নিশ্চয়ই সে শ্রীহরিকে লাভ করিয়া থাকে। আর যে জন সাধুর দ্রোহ আচরণ করে, নিশ্চয়ই সে শ্রীহরির বৈরী হইয়া থাকে।

এইকথা বলিয়া সকলেই সেই ভক্তের ভাব চিত্তে চিন্তা করিতে-করিতে আপন-আপন আবাস অভিমুখে গমন করিলেন। সেবকগণও পরমানন্দে প্রভুকে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে লইয়া গিয়া যে যাহার সেবায় লাগিয়া গেলেন। ভক্তের বিজয়-দুন্দুভি-নাদে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল।

অহো ভগবন্, ধন্য তোমার ভক্ত-বাৎসল্য! বিশুদ্ধ ভক্তির কথা দূরে থাকুক, সামান্য ভক্তির আভাস দেখিলেই তুমি ভুলিয়া যাও! তাই চরিত্রহীন বেশ্যাসঙ্গী বলরাম দাসের প্রতিও তুমি এতদূর কৃপা বিস্তার করিলে। নাথ, ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যাঁহারা সদাচার রক্ষা করিয়া, বিশুদ্ধ চরিত্র বজায় রাখিয়া, নিরপরাধে তোমার ভজনা করেন, তাঁহাদের প্রতি তোমার কতই না করুণা—কতই না প্রীতি।

প্রভু, সংসারের পিচ্ছিল-পথে চলিতে-চলিতে প্রমত্ত জীবের তো পদেপদে পদস্খলন হইবারই কথা। সেই হতভাগ্য পতিত জীবের প্রতি তোমার এতদূর দয়া না থাকিলে কি আর তোমায় 'পতিত-পাবন' বলিয়া কেহ ডাকিত,—না, কেহ তোমার বিশুদ্ধ ভজনপথ অবলম্বন করিত? নিরপরাধের প্রতি করুণা তো সকলেই করিয়া থাকেন। সাপরাধের প্রতি করুণা বিতরণ করাই না কঠিন। সে শক্তি কি সকলের আছে? সাপরাধ

জনেও তোমার এই অবাধ করুণার ধারা বর্ষণ হইতে দেখিয়া আমাদের কেবল শ্রীরূপগোস্বামিপাদের এই মহাবাক্যই মনে পড়ে,—

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাগ্ বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ কমলেক্ষণোঽয়ম্ ॥

আর সঙ্গেসঙ্গে কবিরাজগোস্বামীরও পয়ারের মধুর ঝঙ্কার আমাদের কাণের কাছে বাজিয়া উঠে,—

"ঈশ্বর স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা বহু মানে, আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ ॥"

(চৈঃ চং, অন্ত্য, ১ম পঃ)

দীনবন্ধু দাস।

অবন্তীনগরে উত্তম ব্রাহ্মণকুলে দীনবন্ধুর জন্ম। পত্নী মালতী, দুইটী পুত্র এবং একটি পুত্রবধূ লইয়াই তাঁহার সংসার। ভগবানের কি যে কৃপা, বলা যায় না; এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের পাঁচজনেই যেন একই ছাঁচে ঢালা; দেহ ও আকার কেবল ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু মন প্রাণ সবই এক। সকলেই নিয়ত কৃষ্ণকথা কহিতে ও শুনিতে ভালবাসেন, হরিচরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। সাধুর মুখে হরিকথা শুনিতে পাইলে তাঁহারা সকল ভুলিয়া যান। অসৎসঙ্গে কাহারও আস্থা নাই। মিথ্যা-কথা কেহই কহেন না। পরহিতসাধনই সকলের জীবনব্রত। সাধুসজ্জনের চরণসেবন ও দুঃখি-দরিদ্রকে অন্নবস্ত্রাদি বিতরণ করিতে সকলেই মুক্তহস্ত। তাঁহাদের দ্বারে আসিয়া অতিথি-ফকির কাহাকেও নিরাশ হইয়া ফিরিতে হয় না। অতিথি-সেবাই যে গৃহীর পরম ধর্ম্ম এবং অতিথিকে নিরাশ করিলে সেই অতিথি যে গৃহস্থকে আপন পাপরাশি অর্পণ করিয়া তাহার পুণ্যপুঞ্জ লইয়া চলিয়া যান, এ কথা তাঁহারা সকলেই উত্তম বুঝিয়াছেন। তাই তাঁহারা শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ে যথাশক্তি অতিথির আশা পূর্ণ করিয়া থাকেন। না পারিলে অন্ততঃ সুমিষ্ট বাক্যেও তাঁহাদের সন্তোষ সম্পাদন করেন। তথাপি 'না' কথাটি কাহারও প্রতি প্রয়োগ করেন না।

ফুল ফুটিলে গন্ধ ছাপা থাকে না,—এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের যশঃসৌরভ দিন-দিন দিগদিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, প্রকৃতির রাজ্য ছাড়াইয়া ভগবানের অপ্রাকৃত রাজ্যেও সমাচার প্রচারিত হইয়া পড়িল। না পড়িবেই বা কেন? অতিথির বেশে যাঁহারা আমাদের আবাসে আগমন করেন, তাঁহাদের সকলকে কি আমরা চিনিতে পারি? অতিথির ভিতর ভালও আছে, মন্দও আছে; এ-রাজ্যের লোকও আছে, আর সে-রাজ্যের অর্থাৎ সেই অপ্রাকৃত ভগবদ্রাজ্যের লোকও আছে। অতিথিসেবায় নিষ্ঠা থকিলে একদিন-না-একদিন এক-আধজন সে-রাজ্যের অতিথিরও তো আসিবার কথা। সে-রাজ্যের লোকের আগমন হইয়া গেলে আর সেখানে এখানকার খবর পঁহুছাইতে বড় বিলম্ব হয় কি? হয়-না বলিয়াই তো দীনবন্ধুদাসের সংবাদ সেই দীনবন্ধুর কর্ণে যাইয়া প্রবেশ করিল।

সংসারে আমরা নানা প্রকার ব্যস্ততা দেখিতে পাই, কিন্তু 'অমুক আমায় ভালবাসে' এই কথা জানিতে পারিলে, তাহাকে পাইবার জন্য, তাহার কাছে যাইবার জন্য—'বেড়া নাড়া দিয়া গৃহস্থের মন বুঝা'র মত তাহাকে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিবার জন্য ভগবানের যে প্রকার ব্যস্ততা, তাহার সহিত সাংসারিক তুচ্ছ ব্যস্ততার তুলনাই হয় না। তাই দীনবন্ধুদাসের কথা শুনিবামাত্রই ভগবানের আসন টলিল। যোগি-ঋষিগণ সমাধি-যোগেও যাঁহার দর্শন পাইয়া উঠেন না, সেই ব্রহ্মাণ্ডনাথ আপনিই ত্বরিতগতিতে দীনবন্ধুদাসের উদ্দেশে অবন্তীনগরে আগমন করি-

লেন। আসিয়াই ভক্তের ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তক্ষক নাগকে আহ্বান করিয়া বলিয়া দিলেন,—তুমি সত্বর দীনবন্ধুদাসের ভবনে যাও,—তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে দংশন কর।

ভগবানের আদেশে তক্ষক নাগ তৎক্ষণাৎ যাইয়া দীনবন্ধু দাসের জ্যেষ্ঠপুত্রকে দংশন করিল। তক্ষক-বিষের অসহ্য যাতনায় ছটফট করিতে-করিতে তাহার জীবলীলারও শেষ হইয়া গেল। এই আকস্মিক সর্ব্বনাশে সকলেরই মস্তকে যেন শত সহস্র বজ্র প্রবলবেগে আঘাত করিল। সকলেই শবের চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া তাহার গুণ বিনাইয়া-বিনাইয়া উচ্চনাদে কাঁদিতে লাগিলেন। শোকের আর সীমা-পরিসীমা নাই। সে দৃশ্য দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়।

এমন সময়ে অবন্তীনগরের রাজপথে এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু। সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি-ভূষিত। পরিধান কাষায় বসন। কণ্ঠে তুলসীর মাল্য সংলগ্ন। তাঁহার কমনীয় রূপ দেখিলে বিশ্বসংসার ভুলিয়া যাইতে হয়। সন্ন্যাসী রাজপথের দুইধারে যাহাকে দেখেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন,—হাঁগা দীনবন্ধুদাসের বাড়ী কোথায় গা?

সন্ন্যাসী ঠাকুর এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে-করিতে দীনবন্ধু দাসের বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই—'দীনবন্ধু দাস ও দীনবন্ধুদাস!' বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর আহ্বানধ্বনি ক্রন্দনকোলাহল ভেদ করিয়া দীনবন্ধুদাস প্রভৃতি

সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসীর স্বরের কি যে মোহিনী শক্তি বলা যায় না; সেই সুধা-সুমধুর স্বরে সকলেই যেন বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল, শোকতাপ যেন সকলেই ভুলিয়া গেল, সঙ্গেসঙ্গে ক্রন্দনের উচ্চরোলও থামিয়া গেল। দীনবন্ধু দাস তৎক্ষণাৎ মুখে একটু জল দিয়া, অশ্রু-লালা প্রভৃতি প্রক্ষালন করিয়া, দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভুবনমোহন সন্ন্যাসিমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দভরে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। উঠিয়া কৃতাঞ্জলি-করযুগল কপালে রাখিয়া সন্ন্যাসীকে বিনয়সহকারে বলিলেন,—ঠাকুর গো, এ অধমের প্রতি কি আদেশ করিতেছেন?

দীনবন্ধুদাসের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী বীণা-বিনিন্দিত-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—ওহে দীনবন্ধুদাস! শুনিতে পাই, তুমি নাকি পরম আদরে অতিথিসেবা করিয়া থাক,—দীনদুঃখীকে অকাতরে অন্ন বস্ত্র বিতরণ করিয়া থাক? তোমার এই কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়াই আজ আমি তোমার কাছে আসিয়াছি; তুমি পূতচিত্তে আমাকে অন্ন ভোজন করাও।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া দীনবন্ধুদাস তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক একখানি আসন দিয়া বলিলেন,—ঠাকুর গো, এই আসনে দয়া করিয়া একটু বসুন, আমি আসিতেছি।

এই বলিয়া দীনবন্ধু বাটীর ভিতর স্ত্রীপুত্রাদির নিকটে যাইয়া বলিলেন,—দ্বারে অতিথি আসিয়া ভোজন ভিক্ষা করিতেছেন, এদিকে পুত্রের মৃতদেহও তো পড়িয়া রহিয়াছে; এখন তোমরা শুদ্ধচিত্তে অতিথিসেবা করিতে পারিবে কি না, শীঘ্র আমায় বল!

দীনবন্ধুদাসের অতিথিভক্তিময় বাক্য শ্রবণে তাঁহার পত্নী, পুত্রবধূ ও কনিষ্ঠ পুত্র এককণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—

"মলে ত ন আসই আউ। অতিথিসেবা আগ হেউ॥"

মরিলে তো আর কেহ ফিরিয়া আসে না, আমাদের অতিথিসেবাই সর্ব্বাগ্রে হউক। অতিথিকে নিরাশ করা ভাল নয়।

এই কথা শুনিয়া দীনবন্ধুদাস অতিশয় আনন্দিত হইলেন। একখানি 'মসিনা' (মাদুর) আনিয়া মৃতপুত্রকে তাহাতে শয়ন করাইলেন এবং জড়াইয়া দড়িতে বাঁধিয়া গন্তিরি-মধ্যে (ভিতরকার ঘরে) লুকাইয়া রাখিয়া দিলেন। সকলে মিলিয়া ঘর-দ্বার 'লেপা-পোঁছা' করিলেন, স্নান করিয়া শুদ্ধভাবে রন্ধন চড়াইয়া দিলেন। রন্ধন শেষ হইয়া গেলে দীনবন্ধুদাস সন্ন্যাসীকে অন্দরে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহাকে দিব্য আসনে বসাইয়া অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেন।

সন্ন্যাসী অন্নব্যঞ্জনাদি দেখিয়া যেন একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ওহে, তোমরা করিয়াছ কি, আমিষ রন্ধন কর নাই? আমিষ না হইলে তো আমার আহারই হইবে না; অগত্যা আমাকে ফিরিয়াই যাইতে হইবে দেখিতেছি।"

অতিথিসেবাপরায়ণ ব্রাহ্মণ-পরিবার তখন সন্ন্যাসীকে সানুনয়ে বলিলেন,—ঠাকুর! অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমরা এখনই আমিষ রন্ধন করিয়া দিতেছি। বৈষ্ণবসন্ন্যাসিগণ সাধারণতঃ নিরামিষ আহারই করিয়া থাকেন। তাই আমরা সেই প্রকার আয়োজনই

করিয়াছি। ঠাকুর! আমাদের এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক।

সন্ন্যাসী সেই আসনে বাক্যহীন হইয়া বসিয়াই রহিলেন। এদিকে যতদূর সম্ভব সত্বর মৎস্য সংগ্রহ ও পাক করা হইয়া গেল। সন্ন্যাসীর পাত্রে সেই আমিষ পরিবেশন করিয়া তাঁহাকে ভোজনের জন্য অনুরোধও করা হইল। কিন্তু তবুও সন্ন্যাসী আহার করিলেন না। তিনি আবার এক নূতন কথা তুলিলেন। বলিলেন,—ওহে, তোমরা তো একখানি পাতেই ভাত বাড়িয়াছ; আমি তো একা-একা কখনই খাই না; তোমরা বাড়ীতে যে কয়জন আছ, সকলেরই পাতা হউক, তাতে ভাত বাড়া হউক, তরিতরকারি সব দেওয়া হউক, সকলে আসিয়া খাইতে বসিয়া যাও, তবে আমি ভোজন করিব, নচেৎ এই তোমাদের অন্নব্যঞ্জনাদি সকলই পড়িয়া রহিল, আমি চলিলাম।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তাঁহারা চারিজনে চোখ ঠারাঠারি করিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবিলেন,—আমরা যদি খাইতে না বসি, তাহা হইলে সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই ভোজন করিবেন না,—নিরাশ হইয়া চলিয়া যাইবেন, অতএব সন্ন্যাসীর সহিত আহার করিতে বসা-ই ভাল। অতিথিসেবা তো হইবে, তাহার পর যাহা হইবার হউক।

আবার চারিখানা পাতা করিয়া তাহাতে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করা হইল। কেবল আমিষটা তাহাতে বাদ দেওয়া রহিল। ইহা দেখিয়া সন্ন্যাসী যেন একটু কোপপ্রকাশ করিয়া বলিলেন,—ওহে, তোমাদের পাতে যে মাছ পরিবেশন করিলে না?

বলি ব্যাপারখানা কি ; ও মাছে কি বিষ মাখানো আছে ? ওঃ, জানিলাম,—তোমরা যার-পর-নাই কপট। এই তোমাদের ভাত-টাত সকলই পড়িয়া রহিল, আমি চলিলাম। এই বলিয়া সন্ন্যাসী আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন।

দীনবন্ধুদাস বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন, পত্নী-পুত্রকে কাছে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন ;—এখন করা যায় কি ? পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে—সেই মৃতদেহ বাড়ীতে পড়িয়া রহিয়াছে, তাই আমরা আমিষ খাইতে চাহিতেছি না। সন্ন্যাসী একথা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই ভোজন করিবেন না। তাহার অপেক্ষা চুপেচাপে মাছ-ভাত খাওয়াই ভাল। অতিথিসেবা ত সিদ্ধ হইবে, তার পর যাহা হইবার হয় হউক। ইহা ভাবিয়া সকলেই পাতে মাছ লইয়া সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সকলেরই মনের ভাব—সন্ন্যাসী একবার ভোজনে বসিলে হয়, আমাদের মনোবাঞ্ছা সুসিদ্ধ হইয়া যায়।

সন্ন্যাসী যাহা-যাহা বলিতেছেন, আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত চারিজনে তখনই তাহা সম্পন্ন করিতেছেন। কিন্তু এততেও সন্ন্যাসীর মন পাওয়া গেল না। তাঁহার ভোজন করাও আর হইল না। সন্ন্যাসী আবার এক অভিনব আপত্তি উত্থাপন করিলেন। এবার আর রাগ দেখাইয়া নয়, তাঁহার সেই ভুবন-ভুলানো হাঁসি দেখাইয়া তিনি দীনবন্ধুদাসকে বলিতে লাগিলেন,—ওহে, আমি আসিবার সময় গ্রামেগ্রামে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি তোমার সহধর্ম্মিণী, দুইটী পুত্র ও একটি পুত্রবধূ লইয়া পাঁচজনে এই গৃহে

বাস করিয়া থাক। এখন দেখিতেছি, তোমরা চারিজনে চারিখানা পাতা করিয়াছ। তোমার আর একটি পুত্র কোথায়? তাহাকে লইয়া আইস। তাহার পাতা হউক, তাহাতে অন্নব্যঞ্জনাদি দেওয়া হউক, সে আহারে উপবেশন করুক, তবে আমি ভোজন করিব। যাও,—শীঘ্র যাও, তোমার সেই ছেলেটিকে সত্বর লইয়া আইস।

এই কথা শুনিয়া দীনবন্ধুদাসের হৃদয়ের বল-ভরসা সকলই কোথায় উড়িয়া গেল, শরীর থরথর কাঁপিতে লাগিল। মুখ দিয়া একটি কথাও ফুটিয়া বাহির হইল না। তিনি কেবল ছলছল-নেত্রে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। যেন কত অপরাধী।

দীনবন্ধুদাসের এইপ্রকার ভাবান্তর দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন,—ওহে, তোমার এত ভয় কিসের? কপটতা ছাড়িয়া সত্য করিয়া বল—তোমার আর এক পুত্র কোথায়?

তখন চারিজনেই সন্ন্যাসীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। দীনবন্ধুদাস তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—ঠাকুর, সত্যকথা বলি, শ্রবণ করুন। আমার সেই ছেলেটী সর্পাঘাতে মারা পড়িয়াছে। আমরা কেবল অতিথিসেবার অনুরোধে তাহাকে ঘরের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছি। এখন, যাহা আদেশ হয় করুন।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—এ-ও কি একটা কথা? না দেখিলে একথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আচ্ছা, মড়াছেলে—মড়াছেলেই কই ঘরের ভিতর হইতে লইয়া আইস দেখি?

দীনবন্ধুদাস কি করেন, সন্ন্যাসীর আদেশে তখনই স্ত্রী-পুরুষে যাইয়া ঘরের ভিতর হইতে সেই মাদুর-জড়ানো মড়াছেলেকে

লইয়া আসিলেন এবং মাচুরখানি খুলিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—ওহে দীনবন্ধুদাস, তোমাকে 'জ্ঞানবন্ত' বলে কে? আমিতো দেখিতেছি, তুমি বড় মন্দলোক। তুমি কিনা—

"মলা পুত্রকু গৃহে থোই। বসিচ্ছ, মাচ্ছ-ভাত খাই॥"
মড়াছেলেটকে ঘরের ভিতর পুরিয়া রাখিয়া মাছভাত খাইতে বসিয়া গেছ? আরে ছি ছি!

দীনবন্ধুদাস বলিলেন,—গোঁসাই, তোমায় আর আমি বেশী কি-ই বা বলিব। তবে একটা কথা বলি,—

"কে অটে কাহার কুমর। কে অটে কাহার পিঅর॥
যেসনে চূতবৃক্ষ থাই। তহিঁ বউল বউলই॥
কেতেহেঁ কশিরু ঝড়ই। কেতে বা বঢ়িণ পড়ই॥
কেতে পাচিলা যাএ ডালে। থাইন পড়ে বৃক্ষতলে॥
এমন্তে কেতে ঝড়ি যাই। তা তূলে বৃক্ষ নিকি ধাই॥
এহি প্রকারে এ সংসার। বৃক্ষর ফলর প্রকার॥
তাহার স্থখে সে ঝড়িলা। মোর অতিথিসেবা হেলা॥"

ঠাকুর, বলুন দেখি, এ সংসারে কে-ই বা কাহার পুত্র, আর কে-ই বা কাহার পিতা? যেমন আম্রবৃক্ষ। তাহাতে মুকুল হইতেছে। ছোটছোট কসি আম ধরিতেছে। সেই অবস্থাতেই কতক ঝরিয়া পড়িতেছে। কতক বা কিছু বড় হইয়া পড়িয়া যাইতেছে। আবার কতক-কতক গাছের ডালেই পাকিয়া গিয়া সেই গাছের তলে পতিত হইতেছে। ছোট হউক, বড় হউক, আর মাঝারীই হউক, বৃক্ষ হইতেই ফলগুলি ঝরিয়া-ঝরিয়া পড়ে।

তাই বলিয়া কি বৃক্ষ সেই ফলের সঙ্গে-সঙ্গে ছুটিয়া যায়? এ সংসারও এই প্রকার। শিশু হউক, যুবা হউক, আর বৃদ্ধই হউক, কাল পূর্ণ হইলে ফলের মত সকলেই ঝরিয়া পড়ে। যে ঝরিয়া পড়িবার পড়িয়া গেল, তাহার পাছুপাছু ছুটিবার কোন আবশ্যক আছে কি? আমার পুত্রের কাল পূর্ণ হইয়াছিল—ঝরিয়া পড়িবার উপযুক্ত সময় আসিয়া গিয়াছিল, তাই সে আপনার সুখে আপনি ঝরিয়া পড়িয়াছে। তাহার জন্য কাতর হইলে,—চিন্তাস্রোত তাহার দিকে প্রধাবিত করিয়া রাখিলে আমার চলিবে কেন? না, তাহা রাখা উচিত? তাহাতে কিছু লাভ আছে কি? আমার যে অতিথিসেবা হইল, ইহাই পরম লাভ। ইহার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যই বা কি হইতে পারে?

দীনবন্ধুদাসের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী হাস্য করিতে লাগিলেন এবং দীনবন্ধুর পত্নীর প্রতি বলিলেন,—ওঃ তোমার কি কঠিন প্রাণ। তোমার শরীরে একটুকুও দয়ামায়া নাই। তুমি হইলে ছেলের মা; আর তুমি কিনা—

"মলার পুত্রকু পকাই। বসিচ্ছু মাচ্ছ-ভাত খাই॥"

মড়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া মাছ-ভাত খাইতে বসিয়া গিয়াছ? ছিছি, বড় লজ্জার কথা লজ্জার কথা।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তিনি ধীরেধীরে বলিতে লাগিলেন,—

"স্বরূপ শুন হে গোসাই। মুঁ কে মো পুত্র কে অটই॥
যেসনে চক্রী চক্রখণ্ড। মৃত্তিকা লদি গঢ়ে ভাণ্ড॥
কে গঢ়ু গঢ় ভাঙ্গি যাই। কেহু পোড়িবা যাএ খাই॥

যেবন ভাণ্ড ভাঙ্গি যাই। তা তুলে চক্রী নিকি ধাই॥
সে চক্রীভাণ্ড মুহিঁ শুন। এ সর্ব্ব গোবিন্দ-ভিআণ॥"

গোঁসাই হে, আমি তোমাকে অন্তরের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমিই বা কে, আর আমার পুত্রই বা কে? আমাদের পরস্পর কিসেরই বা সম্বন্ধ? যেমন চক্রী (কুম্ভকার) চক্রখণ্ডের উপর মৃত্তিকা চাপাইয়া ভাঁড় গড়িয়া থাকে। গড়িবার সময় কতক ভাঁড় গড়িতেগড়িতেই ভাঙ্গিয়া যায়। কতক আবার পাঁজা সাজাইয়া পোড়াইবার সময় ভগ্ন হইয়া যায়। যে ভাঁড় ভাঙ্গিয়া যাইবার সে ভাঙ্গিয়া গেল, তাই বলিয়া কি কুম্ভকার সেই ভাঁড়ের সঙ্গেসঙ্গে কখনও ছুটাছুটি চলিয়া যায়? ঠাকুর গো, সেই কুম্ভকারের ভাণ্ডের মত আমাদের পরস্পর সম্বন্ধ। কেহই কাহারও জন্য মরে না। প্রকৃত-পক্ষে কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধই নাই। তবে কিনা, এ সকল সেই লীলাময় শ্রীগোবিন্দেরই লীলাখেলা;—এ সংসার কিংবা এখানকার কৃত্রিম সম্বন্ধ যাহা কিছু সমস্ত তাঁহারই রচনা।

তাঁহার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। তখন তিনি দীনবন্ধুদাসের অপর পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ওহে বাপু, তোমার এ কিরূপ আচরণ? তোমার দাদা মরিয়া গিয়েছেন না? আর তুমি কি না—

"মৃত্যুশবকু তু পকাই। বসিছু মাছ-ভাত খাই॥"

মড়া ভাইকে ফেলিয়া রাখিয়া মাছ-ভাত খাইতে বসিয়া গিয়াছ? ছিছি, বড় লজ্জা বড় লজ্জা! তোমার মত অজ্ঞান ত আর দেখা যায় না।

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকুমার বিনয়-সহকারে বলিয়া উঠিলেন,—

"শুন হে সন্ন্যাস গোসাই। সে মোর কেতে জন্মে ভাই ॥
মুঁ তার কেমন্ত সোদর। এ সর্ব্ব মায়ার সংসার ॥
যেসনে হাটে বণিজার। পসরা বসই অপার ॥
একই ভ্রাত প্রায়ে হোই। বসিণ বিকু থান্তি তহিঁ ॥
ব্যাপার সরই যাহার। সে ব্যক্তি চলে তার পুর ॥
যাহার সরিণ ন থাই। সে নিকি তার সঙ্গে যাই ॥
সেহি প্রকারে এ সংসার। তাহার মোহর ব্যাপার ॥
ব্যাপার সরিলা সে গলা। মোর অতিথিসেবা হেলা ॥"

সন্ন্যাস-গোসাই, আমার কথা শুনুন। যাঁহাকে আমার 'অগ্রজ' বলিতেছেন, তিনি আমার কত জন্মের বড় ভাই, আমিই বা তাঁহার কত জন্মের কনিষ্ঠ ভ্রাতা? কেহই কাহারও নয়। সারা সংসারটাই মায়ার খেলা। সংসার ত নয়, যেন একটা প্রকাণ্ড হাট। হাটে যেমন নানা দেশের ব্যাপারীরা পাশাপাশী পসোরা সাজাইয়া বেচা-কেনা করিতে বসিয়া যায়; তাহাদের পরস্পর কোনকালে কোনরূপ আলাপ-পরিচয় না থাকিলেও, জাতিগত বা ব্যবহারগত ঐক্য না থাকিলেও, যেমন এক-মায়ের সন্তানের মত তাহারা গা-ঘেঁসাঘেঁসি বসিয়া ব্যাপার করিতে থাকে। অথচ ব্যাপার শেষ হইয়া গেলে, কেহ কাহারও খোঁজ খবর না রাখিয়া, যে যাহার বোচকাবুচকি বা পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া আপন আপন গৃহ অভিমুখে চলিয়া যায়, এ সংসার-হাটের ধরণটাও সেই প্রকার। এ হাটের বেচা-কেনা হইয়া গেলে আর থাকিবার যো নাই। দাদার ব্যাপার শেষ হইয়া গেল, তিনি চলিয়া গেলেন। আমার ব্যাপার এখনও শেষ হয় নাই,

সুতরাং থাকিতেই হইবে। ঠাকুর গো, এ হাটে যাহার ব্যাপার শেষ হয় নাই, সে কি কখনও ব্যাপার শেষ করিয়া ঘরমুখো ব্যাপারীর পাছুপাছু ছুটিয়া চলে? আমার যে অতিথিসেবা হইল, ইহাই পরম লাভ।

ব্রাহ্মণকুমারের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী মনেমনে মহা আনন্দ অনুভব করিলেন। মনেমনেই তাহার বুদ্ধির শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহার পর দীনবন্ধুদাসের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে ডাকিয়া বলিলেন,—ওগো বাছা, তোমারই বা আচার-ব্যবহার কি প্রকার? তোমার স্বামী মরিয়া গেলেন, তুমি বিধবা হইলে; তুমি কোথায় বিধবার মত আচার-ব্যবহার করিবে। না, তুমি—

"মৃত্যু পিণ্ডকু ঘরে থোই। আমিষ ভুঞ্জি লোড়ু তুহিঁ॥"

সেই মৃত পতিকে ঘরে রাখিয়া আমিষ ভোজনের জন্য লালায়িত হইয়াছ? ছি ছি, তোমার জ্ঞানি-পণায় ধিক্ ধিক্—শত ধিক্!

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া বিধবা বলিয়া উঠিলেন,—প্রভু, আমার একটা কথা শ্রবণ করুন,—

"কেহু অটই কাহা ভর্ত্তা। কে পুনি কাহার বণিতা।
যেসনে ঘোর বৃষ্টিকালে। নদী পূরণ বহে জলে॥
বনস্ত-কাঠখণ্ড দুই। মিশিন ভাসি যাউ-থাই॥
কেতেহেঁ দূরে ভাসি যান্তে। লতায়ে উহাড়ন্তি পথে॥
তহু গোটিএ লাগি রহি। আরেক খণ্ডি ভাসি যাই॥
যেবন কাঠ ভাসি যাই। আরেক কাঠ কি গোড়াই॥
সেহি প্রকারে এ সংসার। গোবিন্দ-লীলা-খেলঘর॥
বিনা আশ্রিতে সেহি গলা। মোর অতিথিসেবা হেলা॥"

কে কাহার পতি, কে-ই বা কাহার পত্নী? যেমন প্রবল বর্ষাকালে নদীর জল কাণেকাণ হইয়া তরতর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। সেই খরতর স্রোতে দুইখানি বনের কাঠ মিলিয়া-মিশিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। কিছুদূর ভাসিয়া যাইতেযাইতে হঠাৎ পথিমধ্যে নদীতীরের লতা আসিয়া কাঠ দুইখানিকে জড়াইয়া ধরিল। দুইখানির একখানি কাঠ সেই লতার বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গেল, আর একখানি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া ভাসিয়া চলিয়া গেল। ঠাকুর গো, এ সংসারের মেলামেশাও সেই প্রকার, আর ছাড়াছাড়িও সেই প্রকার। নদীবেগে যে কাঠখানি ভাসিয়া চলিয়া গেল, লতাবিতানে আবদ্ধ কাঠখানি কি কখনও তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ দৌড় দিতে থাকে? যে আশ্রয় পাইল, সে থাকিয়া গেল, আর যে পাইল না, সে চলিয়া গেল। তাহাতে কাহারও কিছু আসে যায় না। এ সংসার সেই লীলাময় শ্রীগোবিন্দের খেলাঘর। তিনি এই খেলাঘরে যে কত খেলা—কত মিলন-বিচ্ছেদের খেলা—কত হাঁসি-কান্নার খেলা—কত ভাঙ্গাগড়ার খেলা প্রতিনিয়ত খেলিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নিরূপণ করা যায় না। আমার পতি আশ্রয় পাইলেন না, তাই কালের স্রোতে কোন্ অলক্ষ্য প্রদেশে তিনি ভাসিয়া চলিয়া গেলেন। আমি যে কর্ম্মসূত্রে বাঁধা পড়িয়া আছি। আমার তো আর কোথাও যাইবার যো নাই। এ অবস্থায় আমার যে অতিথিসেবা হইল, ইহাই পরম লাভ।

সন্ন্যাসী এই কথা শুনিয়া মনেমনে বলিলেন,—"অহো! এ চারিজনেরই মন ধন্য! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এ চারিজনের মত তো কই

আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারাই ইহাদের তুলনা।" এইরূপ সাধুবাদ দিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ জল ও তুলসী লইয়া সেই মৃতের মুখে সিঞ্চন করিলেন এবং জলদগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—ওহে বিপ্রকুমার, গাত্রোত্থান কর—গাত্রোত্থান কর।

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইতে-না-হইতে সেই মৃত শরীরে জীবনী-শক্তি আবার আসিয়া দেখা দিল। বিপ্রকুমার যেন নিদ্রা হইতে উঠিয়া উপবেশন করিলেন এবং সম্মুখে সেই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

সন্ন্যাসীর প্রভাব দেখিয়া সকলে মহা বিস্মিত হইলেন। কিন্তু অহো কি ভাগবতী মায়া, তখনও কেহ সে সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিলেন না ;—এ সন্ন্যাসী সহজ সন্ন্যাসী নন। যাঁহার জন্য শত সহস্র লোকে বিষয়-বৈভব আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন, ইনি সেই সকল সন্ন্যাসীর মূল সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী করার গুরু সন্ন্যাসী! সকলে যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে অভিভূত হইয়া সন্ন্যাসীর সেই কমনীয় মুখের দিকে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিলেন ; আর তাঁহাদের পলকহীন নয়ন হইতে দরদর ধারে আনন্দের ধারা ধরায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সকলেরই মনে কেবল একই প্রশ্ন,—এ সন্ন্যাসী ঠাকুর কে ?

সন্ন্যাসীও সহাস্যবদনে তৎকালজীবিত ব্রাহ্মণ-কুমারকে বলিতে লাগিলেন,—

"প্রভু বোইলে—আরে সুত। মুঁ ত দেখিলি বিপরীত ॥

দেখ তো জননী পিয়র। আবর পত্নী সহোদর ॥
তোর অর্জ্জনে করি আশ। খটিণ থান্তি তোর পাশ ॥
এবে তো মৃত্যুকাল দেখি। গুপত করি তোতে রখি ॥
বসিলে মাচ্ছ-ভাত খাই। কেহ্নে এহাঙ্ক ঘরে তুহি ॥
হোইণ অচ্ছু রে নন্দন। ধিক্ এ তোহর জীবন ॥”

ওহে বিপ্রকুমার, আমি তো বড়ই বিপরীত দেখিতেছি। দেখ, তোমার মাতা পিতা বনিতা ও ভ্রাতা সকলে তোমার উপার্জ্জনের আশা করিয়াই তোমার জন্য খাটাখাটুনি করিত। কিন্তু আজ তোমার মৃত্যু হইয়াছে দেখিয়া সকলে তোমাকে ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া মাছ-ভাত খাইতে বসিয়া গিয়াছে। হায় হায়! তুমি এমনতর লোকের ঘরে ছেলে হ'য়ে আসিয়াছ কেন? তোমার জীবনে ধিক্—জীবনে ধিক্।

সন্ন্যাসিগোস্বামীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া উঠিলেন,—

“কে কার জননী পিয়র। কে কার ভ্রাত সহোদর ॥
কে কার অটই যুবতী। কে পুনি অটে কাহা পতি ॥
মিথ্যা অটই এ সংসার। কেহি ত নুহই কাহার ॥
যেসনে ঘোর গ্রীষ্মকালে। পথরে পথিক সকলে ॥
পাক্ষ-পক্ষিণ যাউ থান্তি। বাটরে বৃক্ষেক দেখন্তি ॥
এক-গৃহর প্রায়ে হোই। বসন্তি তথি-তলে যাই ॥
শ্রম সরিলে যে-ঝা-মতে। চলন্তি বৃক্ষ থাই পথে ॥
সেহি প্রকার এ সংসার। ঋণানুবন্ধন বেভার ॥
এথকু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন। সাধুঙ্ক সেবা প্রতিদিন ॥
করি বঞ্চই যেউ নর। ধন্য জীবন বোলি তার ॥”

ঠাকুর হে, কে কাহার জননী-পিতা, কে কাহার সহোদর-ভ্রাতা,

কে কাহার যুবতী, আর কে-ই বা কাহার পতি? এ সংসার মিথ্যা। কেহই তো কাহারও নয়। যেমন দেখিতে পাই,—ঘোরতর গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড রৌদ্র। পথে পাঁচ-সাত বিশ-পঁচিশ জন পথিক যাইতেছে। যাইতেযাইতে তাহারা পথের মাঝে বেশ একটি বড় ছায়াবৃক্ষ দেখিতে পাইল। অমনি তাপ জুড়াইবার জন্ত সকলে সেই বৃক্ষের তলে একপরিবারের মত যাইয়া বসবাস করিতে লাগিল। আবার তাপ শান্তি হইলে যাহার যেদিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে থাকিল। পথের বৃক্ষ পথেই পড়িয়া রহিল। সারা সংসারটাও এই প্রকার। এখানকার ব্যবহারও ঐ ধরণের। গাছের তলে মেলামেশার মত এখানকার মেলামেশা। গাছের তলে ছাড়াছাড়ির মত এখানকারও ছাড়াছাড়ি। তাপ শান্তি পর্য্যন্তই যেমন পথিকের পরস্পর সম্বন্ধ, তেমনই কোন-না-কোন জন্মের ঋণ পরিশোধ পর্য্যন্তই এখানকার পরস্পর সম্বন্ধ। তাপ শান্তি হইয়া গেলে পথিক আর বৃক্ষতলে থাকে না। ঋণ শোধ হইয়া গেলে এখানকারও কেহ এক মুহূর্ত্ত গৃহে অবস্থান করে না। গাছের তলে থাকিবার জন্ম কেহ আসে না, যাইবার জন্তই আসে; এ সংসারেও সেইরূপ থাকিবার জন্ত কেহই আসে না, যাইবার জন্তই আসে। এখানকার এই অল্প অনিরূপিত অবস্থানকালের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের ভজন ও সাধুসজ্জনের সেবা করিয়া, জীবনযাপন করিতে পারে, তাহারই জীবন ধন্ত ও কৃতার্থ হইয়া যায়। তাহারই এখানে আসা সার্থক।

কুমারের কথা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসীর আনন্দ আর ধরে না।

তিনি মনেমনে বলিলেন,—অহো! এই পাঁচ জনেরই কি বিশুদ্ধ ভাব। ধন্য ইহারা। ইহাদের হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধরণী আজ ধন্যা হইলেন।

এইবার সন্ন্যাসী রাশিরাশি আনন্দের হাঁসি হাসিতেহাসিতে প্রীতিপ্রকম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—দীনবন্ধুদাস, বৎস! তোমাদের পাঁচজনেরই অকপট ব্যবহার, অতিথিসেবায় আন্তরিক অনুরাগ এবং ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি দেখিয়া আমি অপরিমিত আনন্দ লাভ করিয়াছি। আজি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি,—

"জীবন্তে সুখী হোই থাও। মলে শ্রীহরি-পাদ পাও॥"

তোমরা পরম সুখে জীবন যাপন কর এবং অন্তে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ কর।

সন্ন্যাসীর এই আশীর্ব্বাদবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার চরণতলে যুগপৎ পতিত হইলেন। সকলেরই প্রাণের কথা—ঐ অভয় পাদপদ্ম-তলে যেন চিরদিনই পড়িয়া থাকি।

সন্ন্যাসীও সকলের মস্তকে সুকোমল হস্ত অর্পণ করিয়া বরদান করিলেন,—"তোমাদের ভয় দূর হউক, ভয় দূর হউক। এককে ছাড়িয়া দুইএ মজিলেই ভয় দেখা দেয়। তোমরা সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানেই অহরহ মজিয়া থাক। এই বিশাল বিরাট দুইএর রাজা—ভয়ের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি 'সংসার' আর তোমাদিগকে কিছুতেই অভিভূত করিতে পারিবে না। আমার বরে তোমরা অভয় হও—অভয় হও।"

তখন যেন সকলে কোন্ এক নেশার আবেশে আপন-হারা। সকলের শরীর মন প্রাণ সকলই যেন এলাইয়া পড়িয়াছে। সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্ত হইতে কাহারও আর সরিয়া যাইবার সাধও নাই, সাধ্যও নাই। এক অপূর্ব্ব আনন্দ-আলস্যে সকলেই জড় হইয়া গিয়াছেন। এমন সময় কে যেন তাঁহাদের কাণের কাছে কম-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"তোমরা তো আমায় চিনিতে পারিলে না, আমি চলিলাম! আমি ধরা দিব বলিয়া আসিয়াছিলাম, তোমরা তো আমায় ধরিয়া রাখিতে পারিলে না, আমি চলিলাম। চলিলাম বটে, কিন্তু তোমাদের আপদ-বালাই সকল লইয়া চলিলাম,—তোমাদের ভাব-মূল্যে কেনা হইয়াই চলিলাম। আমি চিরদিন তোমাদের হৃদয়ে-হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিব। দেখো তোমরা যেন আমায় ভুলিও না। তোমরা আমার, আর আমি তোমাদেরই, এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও। তবে আমি যাই। তোমাদের ছাড়িয়া যাইতেও প্রাণ যেন কাঁদিয়া-কাঁদিয়া উঠিতেছে। কিন্তু কি করি, আমায় যাইতেই হইবে। আমার যে নানান ঝঞ্ঝাট। তাই আমি চলিলাম, তোমরা কিছু মনে করিও না। তবে যাইবার সময় আমার পরিচয়টাও তোমাদের দিয়া যাই। আমি কে জান ?—আমি সেই জগজ্জীবন ভগবান্।"

ভগবানের ভুবন-ভুলনো ভাষায় সকলে চমকভাঙ্গা হইয়া চাহিয়া দেখেন,—সেই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসিমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছেন। যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি, ভাবিয়া সকলের যে আনন্দ-আবেশ-টুকু আসিয়াছিল, এইবার তাহা একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন,—চারিদিকেই ছুটাছুটি খোঁজাখুজি

আরম্ভ করিয়া দিলেন; কিন্তু হায়, কোথায় বা সন্ন্যাসী—আর কোথায় বা ভগবান্!

তখন পাঁচজনেই কাঁদিতে-কাঁদিতে তাঁহার উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—ঠাকুর হে, তোমাকে দয়ালু বলে কে? তোমার মত নিষ্ঠুর-হৃদয় তো আর দেখা যায় না। যদি দিবারই বাসনা নাই, তবে নিধি দেখাইবার কি আবশ্যক ছিল। আবার সেই নিধি হরিয়া লইয়াই বা কি পৌরুষ প্রকাশ করিলে? একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেও তো দিলে না। পিছু ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতে-না-দেখিতে সে নিধি হরণ করিয়া ফেলিলে। তুমি মায়াবীর অগ্রগণ্য। ব্রহ্মা-আদি দেবগণও যখন তোমার মায়ায় মুগ্ধ—তোমার মায়ার খেলা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তখন কীটাণুকীট আমরা কোথায় লাগি। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তোমাকে আর অধিক কি-বলিব। তুমি আমাদিগকে ভালবাসার মোহনমন্ত্র শুনাইয়া যে কৃপা প্রকাশ করিয়াছ, আমরা যেন সেই কৃপাকণিকাটুকু চির-দিন উপভোগ করিতে পারি,—ধ্রুবনক্ষত্রের মত সেই কৃপার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভীষণ ভবসাগরের পারে গমন করিতে পারি।

ভগবানের আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবার নহে। তাঁহার বরে ব্রাহ্মণ-পরিবার অতিথিসেবা, সাধুসঙ্গ ও হরিভজন করিয়া পরমানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন এবং দেহান্তে সকলেই সেই শ্রীহরির অভয়পদ লাভ করিলেন।

আমরা আর এবার ভক্ত বা ভগবান্ কাহারও জয় ঘোষণা করিব না। এবার জয় ঘোষণা করিব—গার্হস্থ্য আশ্রমের। এই

আশ্রমেই না এই অমৃতোপম অতিথিসেবার ব্যবস্থা। এই অতিথি-সেবাই না ভগবানকে কোন্ অপ্রাকৃত ধাম হইতে অতিথির বেশে আকর্ষণ করিয়া আনিল। ভাই গৃহী, তোমার আশ্রমে যখন অতিথি-সেবা রহিয়াছে, তখন তোমার ভয়ই বা কি, আর ভাবনাই বা কি? তুমি শ্রীহরির প্রীতিকামনায় অতিথির কামনা পূর্ণ করিও। ক্ষমতায় না কুলাইলে, দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়াও তাঁহাদের সন্তোষ সম্পাদন করিও, দেখিবে—নিশ্চয় দেখিবে, দীনবন্ধুদাসের মত তোমার দ্বারেও একদিন অনাথনাথ অতিথিবেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

বিশ্বম্ভর দাস।

উড়িষ্যাদেশে ঢেঙ্কানাল অতি প্রসিদ্ধ স্থান। বিশ্বম্ভর দাস সেই স্থানেই বাস করিতেন। তিনি করণ জাতি—এক রকম বেণিয়া। পরিবারবর্গ বড় বেশী নয়—এক স্ত্রী ও একটি পুত্র লইয়াই তাঁহার ঘরকরণা। বিশ্বম্ভর ভারি ভগবদ্ভক্ত। তাঁহার পত্নী রেবতী যার-পর-নাই পতিপরায়ণা। পুত্র রঘুনাথও পিতার সতত আজ্ঞানুবর্ত্তী। তিনটী প্রাণী যেন একটি সুরে বাঁধা তিনটী যন্ত্র। একের হৃদয়তন্ত্রীতে যে স্বর বাজিয়া উঠে, আর দুইটীর হৃদয়তন্ত্রীতে তাহার ঝঙ্কার আপনা-আপনিই হইতে থাকে। তিনজনেরই মতিগতি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে। তিনজনেই নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। তিন-জনেই অহরহ শ্রীনামভজনে মাতিয়া রহেন। যদি কেহ তাঁহাদের কাছে নামমহিমা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা আর তাঁহাকে ছাড়িতে চান না। যাইতে চাহিলেও 'আর একটু বসুন,—আর একটু বসুন' বলিয়া যাইতে দেন না। যাঁহার মুখে একটি 'নাম' শুনিতে পান, তাঁহাকেই গুরুর মত মান্য করিয়া থাকেন। নামে তাঁহাদের এতই শ্রদ্ধা এতই প্রীতি।

বিশ্বম্ভরদাস সামান্য গৃহস্থ লোক। অবস্থা তত ভাল নয়। কিন্তু তাঁহার দ্বারে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যোগি-সন্ন্যাসী অতিথি-অভ্যাগত যতই আসুন, তিনি একটুও বিরক্ত হইতেন না। যথাসাধ্য যত্ন-সহকারে সকলেরই সৎকার করিতেন। কাহাকে অন্ন দিয়া কাহাকে

বা বস্ত্র দিয়া তাহার উপর বিনয়-বচন বলিয়া সকলকেই সম্মানিত ও সন্তুষ্ট করিতেন। তবু নিরাশসূচক 'না' কথাটি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে পারিতেন না।

বিশ্বম্ভরদাস বড় দাতা, এ কথা তখন মুখেমুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। কথায়-কথায় বিশ্বম্ভরদাসের কথা উঠিলে 'ধন্য ধন্য' রবের ধুম পড়িয়া যাইতে লাগিল। দেখিতেদেখিতে বিশ্বম্ভরের যশে বিশ্ব-সংসার ছাইয়া ফেলিল।

দৈবের খেলা বুঝা ভার। এ সংসারের আমি তুমি এ ও সে—সকলেই সেই দৈবের খেলার সামগ্রী। তিনি কখন কাহাকে লইয়া কিসের জন্য যে কি খেলা খেলেন, কিছুই বুঝা যায় না। তোমাকে লইয়া খেলা আরম্ভ হইলে আমি তোমার খেলা দেখি, হাসির খেলা হয়তো হাসি, কান্নার খেলা হয়তো কাঁদি, আর হাসি-কান্নার অতীত অন্য কোন খেলা হইলে বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকি। তোমার বেলায় যেমন আমি দেখি, আমার বেলায় তেমনি তুমিও দেখ। কিন্তু "কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন"—এ রহস্যের উদ্ভেদ করিতে আমরা কেহই পারি না।

এ সংসারে আসিয়া দৈবের এ খেলার আবর্ত্তে পড়ে না কে? একদিন-না-একদিন সকলকেই পড়িতে হয়। তাই আজ ভক্ত বিশ্বম্ভরদাসকেও সেই খেলার আমলে আসিতে হইয়াছে। এ খেলাটা কিরূপে আরম্ভ হইল,—বলিতেছি।

ভগবানের প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তম পরম ভাগবতগণ কখন এক স্থানে অবস্থান করেন না। তাঁহারা তীর্থযাত্রার ছলা ধরিয়া দেশেদেশে

ঘুরিয়া বেড়ান। একবার যাঁহার নাম করিলে মহা মহা অপবিত্রও পবিত্র হইয়া যায়, সেই ভগবান্‌কে যাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে চির অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের তো আর নিজেকে পবিত্র করিবার জন্য তীর্থযাত্রা নয়; জীব-উদ্ধারের জন্যই তাঁহাদের এই তীর্থযাত্রা। তাঁহারা এক স্থানে বসিয়া থাকিলে তো আর জগতের পাপী তাপী জীবের গতি কিছু হইয়া উঠিত না, তাই তাঁহারা তাঁহাদের হৃদ্বিহারী হরির প্রেরণাতেই হউক, আর তাঁহাদের অপরিসীম দয়ার প্রেরণাতেই হউক, তীর্থযাত্রার ব্যপদেশে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের এক কাজে দুই কাজই হয়। এক দিকে তাঁহারা ভিখারীর ভঙ্গীতে গৃহীর গৃহে গমন করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়া আসেন; অপরদিকে অবিশ্রান্ত পাপীর পাপ লইয়া-লইয়া তীর্থেরও যে মলিনতা আসিয়া যায়, সে মলিনতাও নাশ করিয়া আসেন।

যাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে হরিকে পুরিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা না পারেন কি? হরি তাঁহাদের হাত-ধরা। তাঁহাদের হরি তাঁহারা যাকে-ইচ্ছা তাকেই দিতে পারেন। শ্রদ্ধাদত্ত একমুষ্টি অন্ন বা দুইটি সুমিষ্ট কথার বিনিময়ে তাঁহারা সামান্য ধনরত্ন কি—অমূল্য ও অতি দুর্লভ তাঁহাদের প্রাণের হরিকেও অকাতরে দান করিয়া আসেন। গৃহীর দানের প্রতিদানে দয়ার প্রস্রবণ ভাগবতগণের আর বুঝি মনে থাকে না,—আমরা আমাদের হৃদয়সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিতেছি। পার্থিব পদার্থের মত হরির নাকি ক্ষয় নাই, নাশ নাই, তাই এত দিয়েও সাধুর হৃদয় হইতে হরি আর ফুরাইয়া যান

না। হরি আমার এ জগতের সামগ্রী হইলে পরম দয়াল ভক্তের হাতে পড়িয়া কবে যে ফুরাইয়া যাইতেন, তাহা আর বলা যায় না।

সে যাহা হউক, একদিন এইরূপ একদল তৈর্থিক সন্ন্যাসী দেশেদেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেবেড়াইতে বিশ্বম্ভরদাসের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে যে দেখে, সে-ই বলে, এই গ্রামে বিশ্বম্ভরদাসের বাড়ী; আপনারা তাঁহার গৃহে গমন করুন, তিনি অবশ্য ভোজন দানে আপনাদিগকে আনন্দিত করিবেন।

সাধুগণ এই প্রকার একই কথা শুনিতেশুনিতে,—তাঁহাদিগেরই প্রদর্শিত পথে চলিতেচলিতে বিশ্বম্ভরদাসের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা আর নাই। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সাধুবৃন্দ দ্বারে রহিয়াই উচ্চস্বরে আহ্বান করিলেন,—বিশ্বম্ভর, ওহে ও বিশ্বম্ভর! একবার এদিকে এস ত।

অতিথিসেবার যাঁহাদের নিষ্ঠা আছে, তাঁহাদিগের কর্ণদ্বয় অতিথির কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকে। সাধুগণের প্রার্থনাবাণী মুখ হইতে সম্পূর্ণ বাহির হইতে-না-হইতে বিশ্বম্ভরদাস শশব্যস্তে তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভুবনপাবন সন্ন্যাসিগণকে দেখিয়া চর্ম্মচক্ষু সার্থক করিয়া লইলেন। পরে সকলের পদতলে পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। উঠিয়া—হাত দুইটি যোড় করিয়া কপালে রাখিয়া বিনয় সহকারে বলিলেন,—অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য, আজ আমি ধন্য হইলাম, ধন্য হইলাম, ঠাকুর, এখন কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।

তাঁহারা বলিলেন,—বাবা বিশ্বম্ভর, আমরা তোমার বড় যশ

শুনিয়াই আসিয়াছি। আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত। শীঘ্র আহারের আয়োজন করিয়া দাও।—হাণ্ডী-কাষ্ঠ, চাল-দাল, দুধ-দহি, ঘৃত-নবাত, তরি-তরকারি প্রভৃতি লইয়া আইস; যাও, আর বিলম্ব করিও না, আমাদিগকে ক্ষুধার অন্ন দান করিয়া অপরিমিত পুণ্য সঞ্চয় কর।

বিশ্বম্ভর 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বাটীর ভিতর গমন করিলেন, স্ত্রী-পুত্রকে সকল কথা বলিলেন এবং সকলে মিলিয়া অতিথি-সেবার সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সকল সামগ্রীই সংগ্রহ হইল, হইল না কেবল ঘৃত। তাহাই তাঁহারা সাধুবৃন্দের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—ঠাকুর, আপনাদের আদিষ্ট সকল সামগ্রীই আনিয়াছি, কেবল ঘৃত সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

উত্তরে সাধুগণ বলিলেন,—ঘৃতহীন ভোজন ভোজনই নয়। বিশেষত আমরা ঘৃতহীন অন্ন ভগবান্‌কে অর্পণ করিব কি প্রকারে? তা বাপু তোমার সামগ্রী তুমি ফিরাইয়া লইয়া যাও, ইহা আমাদের কোন প্রয়োজনেই আসিবে না।

এই কথা শুনিয়া বিশ্বম্ভরের পুত্র রঘুনাথ অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহাদের চরণতলে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন,—প্রভু, আমাদের অপরাধ লইবেন না, কৃপা করিয়া রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিউন, দীনবন্ধুর কৃপায় রাঁধিতেরাঁধিতেই ঘৃত আসিয়া যাইবে এখন। তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। রঘুনাথের কথায় অতিথিগণও আনন্দ-সহকারে রন্ধন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে পিতা-পুত্র ঘরে আসিয়া সল্লা-পরামর্শ করিতে লাগিলেন,—এই রাত্রিকালে ঘৃত পাওয়া যায় কোথায়? ঘৃত না পাইলেও বিষম বিপদ্;—অতিথি নিরাশ হইয়া যাইবেন। জীবন থাকিতে অতিথিই যদি নিরাশ হইয়া যাইলেন, তবে আর সে জীবনে ফল কি? অতিথি বিমুখ হইয়া গেলে ইহলোকে অপযশ, পরলোকেও অনন্ত নরক। এখন করা যায় কি? ভাল, একবার এখানে-ওখানে তল্লাস করিয়াই দেখা যাউক, তাহার পর অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।

পিতা-পুত্রে পাতিপাতি করিয়া সমগ্র গ্রাম অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু ঘৃত কোথাও মিলিল না। উভয়েই বিষণ্ণ-মনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। চিন্তা যেন শতশত বৃশ্চিকের মত তাঁহাদের দংশন করিতে লাগিল। তাঁহারা যেন জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ বিশ্বম্ভরদাস বলিয়া উঠিলেন,—বৎস, শুনিয়াছি শাস্ত্রে বলে—পরের উপকার কিংবা সাধুসেবার জন্য যদি কেহ মিথ্যা কথা বলে, অথবা চুরি করে, তাহা হইলে তাহাতে তাহার কোন দোষ হয় না। আমরা যখন এত খুঁজিয়াপাতিয়াও ঘৃত সংগ্রহ করিতে পারিলাম না, তখন সাধুসেবার অনুরোধে চুরি করিতেই বা ক্ষতি কি? দেখিতেদেখিতে রাত্রিও অধিক হইয়া যাইতেছে। এখন ইহা ছাড়া অন্য উপায়ই বা কি আছে?

পিতার কথায় পুত্রেরও মত হইল। কোন ভাগ্যবানের ভবন হইতে ঘৃত অপহরণ করিয়া আনাই স্থির হইয়া গেল। পিতা-পুত্রে একখানি শাণিত অস্ত্র এবং একটি সাবল (খন্তা) লইয়া গোবিন্দ স্মরণ করিতে-করিতে বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন।

সাধুসেবায় অকপট অনুরাগে তাঁহাদের অন্তর-বাহির অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সুতরাং চুরি করায় যে ফেঁসাদ কত, অবশেষে ধরা পড়িয়া গেলে লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই বা কত, তাহা আর তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না। তাঁহারা এক ভাগ্যবানের গৃহে গিয়া 'সিঁদ' কাটিলেন। পুত্র সিঁদ দিয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পিতা বাহিরে থাকিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন।

বড় লোকের বাড়ী। ঘরের চারিদিকেই স্তরেস্তরে ধন-রত্ন। রঘুনাথ বড় বিপদেই পড়িলেন। এঘর ওঘর যে ঘরই দেখেন—সকল ঘরই হীরক-মণি-মাণিক্যে স্বর্ণ-রৌপ্য-অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। সাধুসেবার ঘৃত-প্রার্থী রঘুনাথের এ সকল লইয়া তো কিছু হইবে না, তাই তিনি বড় ব্যতিব্যস্তেই পড়িয়া গেলেন। যে ধন-রত্ন মণি-মাণিক্য দেখিলে অনেক মুনির মনও টলিয়া যায়—লোভ সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে, রঘুনাথ সে সকল একবার অঙ্গুলির অগ্রেও স্পর্শ করিলেন না। তিনি অতি বিরক্তির সহিতই সে সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঘৃতভাণ্ডই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপ খুঁজিতে-খুঁজিতে তিনি যখন একস্থানে কয়েকটি ঘৃতভাণ্ড দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি তাহার মধ্য হইতে সাধুসেবার আবশ্যকমত দুইটি ভাণ্ড দুই হস্তে লইলেন এবং সিঁদের গর্ত্ত দিয়া গলাইয়া পিতাকে প্রদান করিলেন। নিজেও সিঁদের ভিতর দিয়া বাহির হইতে লাগিলেন। ঘৃত-ভাণ্ড পাইয়া পিতা বিশ্বম্ভরও আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

পিতা-পুত্র যে চুরি করিতে আসিয়াছেন, তাহা যেন ক্ষণতরে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের আনন্দকলরবে গৃহস্বামী জাগরিত হইয়া উঠিলেন। উঠিয়া দেখেন, সিঁদের ভিতর দিয়া চোর পলাইয়া যাইতেছে। আর যায় কোথা, তিনি বায়ুবেগে আসিয়া রঘুনাথের চরণ চাপিয়া ধরিলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া দুই হাতে দুইটি পা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথ দেখিলেন, মহাবিপদ্! সিঁদের বাহিরে তাঁহার মুণ্ড, পা দুইটা ঘরের ভিতর, অবশিষ্ট অবয়ব সিঁদের মধ্যে; নিজের ক্ষমতায় আর বাহিরে যাওয়া চলে না। তাই পিতাকে বলিয়া উঠিলেন,—বাবা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমি ধরা পড়িয়া গেছি; ভিতর হইতে কে আমার পা দুইটি ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতেছে, যদি আপনি পারেন তো আমার মাথা ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া টানিয়া বাহির করুন, নচেৎ অন্য উপায় নাই।

বিশ্বম্ভর কি করেন। পুত্রের কথা শুনিয়া তাঁহার মহা ভয় হইল। তিনি তাঁহার সর্ব্বভয়হারী শ্রীহরিকে প্রাণ ভরিয়া স্মরণ করিতে-করিতে পুত্রের মাথা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। ভিতরে গৃহস্বামী পা ধরিয়া টানিতেছেন, বাহিরে বিশ্বম্ভর মাথা ধরিয়া টানিতেছেন, দুইটানায় পড়িয়া রঘুনাথের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। গৃহস্বামী ও বিশ্বম্ভর উভয়েই সমান বলবান্, সুতরাং যেখানকার রঘুনাথ সেইখানেই থাকিয়া টানাটানির কষ্ট সহ্য করিতে থাকিলেন। না গৃহস্বামী রঘুনাথকে টানিয়া ঘরের মধ্যে আনিতে পারেন, না বিশ্বম্ভর তাহাকে

টানিয়া ঘরের বাহিরে আনিতে পারেন। এইরূপ ধ্বস্তাধ্বস্তি অনেকক্ষণ চলিল। রাত্রিও অধিক হইয়া যাইতে লাগিল। যে সাধুসেবার জন্য এত কাণ্ড, সেই সাধুসেবাও পণ্ড হইতে চলিল, দেখিয়া রঘুনাথ পিতাকে দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—

"স্বরূপ শুন আহে তাত। এথর সরিলা মহত্ব॥
রাত্র যন্থপি পাহি যিব। চিহ্নি সাধুত দণ্ড দেব॥
সাধুঙ্ক সেবাহিঁ নোহিব। এতেক কষ্ট ব্যর্থ হেব॥
এথকু বিচার ন কর। কাটিণ নিঅ মোর শির॥
সাধুমানঙ্ক সেবা হেউ। আন্তর মহত্ব ন যাউ॥
মুণ্ড ন থিলে পিণ্ড এথে। চিহ্না ন যিব কদাচিতে॥
এথকু ন কর তু হেল। মো মুণ্ড ঘৃত ঘেনি চল॥"

কি ভয়ঙ্কর কথা; শুনিলেও সকল শরীর শিহরিয়া উঠে! রঘুনাথ বলিতেছেন কি,—"পিতঃ, তুমি আমার মস্তক ছেদন কর। আর বিলম্ব করিও না। ঐ ঐ দেখ, রাত্রি অধিক হইয়া যাইতেছে। গৃহে ক্ষুধার্ত্ত সাধুগণ ঘৃত প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাত্রি পোহাইয়া গেলে সকলে আমাকে চিনিয়া ফেলিবে,— আমাদিগের মহত্বও সরিয়া যাইবে, দণ্ডও ভোগ করিতে হইবে। অথচ সাধুসেবাও হইবে না। যাহার জন্য এত কষ্ট, সে কষ্টও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাহার অপেক্ষা সাধুসেবাও হউক, সঙ্গে-সঙ্গে আমাদিগের মহত্বও রক্ষা পাউক। দেহে মুণ্ড না থাকিলে, কেবল ধড় দেখিয়া তো কেহ আর চিনিতে পারিবে না। তাই বলি, আর বিলম্বে কাজ নাই, ঐ শাণিত অস্ত্র দিয়া আমার মাথা কাটিয়া ফেল এবং ঘৃতভাণ্ড ও ছিন্নমুণ্ড লইয়া গৃহে চলিয়া

যাও।” রঘুনাথের কথা শুনিয়া পিতার মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। তিনি যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন,—স্নেহে ভয়ে ও শোকে যেন কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সাধু-সেবার অনুরাগে তাঁহার সে ভাব তখনই অন্তর্হিত হইল। এদিকে পিতার বিলম্ব দেখিয়া রঘুনাথ অধিকতর উত্তেজনার স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—মায়ায় ভুলিও না পিতা, ঐ তোমার হস্তেই তো শাণিত অস্ত্র রহিয়াছে, তবে আর বিলম্ব কেন, দৃঢ়মুষ্টিতে অস্ত্র ধারণ কর, এক আঘাতে আমার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেল। উদ্দেশ্য ভুলিও না পিতা, উদ্দেশ্য—সাধু-সেবা, সাধু-সেবা, সাধু-সেবা।

হায় অনুরাগ, তুমি এমনি করিয়াই সকলকে অন্ধ কর বটে। হায় তুমি কাহাকেও কিছুই দেখিতে দাও না। তুমি কখন যে কাহাকে কাহার টানে ফেলিয়া দাও, বলা যায় না। যাহাকে যাহাতেই ফেলিয়া দাও না কেন, তোমার এমনি অমিত প্রভাব যে, তুমি কেবল সেইটি ছাড়া—যেটিতে ফেলিয়াছ সেইটি ছাড়া; তাহাকে আর সকলই ভুলাইয়া দাও;—তাহার হিতাহিত বা কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য জ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দাও। তোমার পাল্লায় পড়িলে তোমার চোখেই দেখিতে হয়, শুধু দেখা কেন, সকল কার্য্যই তোমারই মতে করিতে হয়,—তা সে যত বড় কাজই হউক না কেন। এমনি তোমার অপার মহিমা! তুমি যাহাকে ধনের টানে ফেল, সে ধন ছাড়া আর সকল ভুলিয়া যায়; অন্যে পরে কা কথা, সে ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম সে কিছুই দেখিতে পায় না। দেখে কেবল—টাকা, টাকা আর টাকা। অনুরাগ, তুমি

যাহাকে কামিনীর আকর্ষণে নিক্ষেপ কর, সে-ও সেই কামিনী ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না, সে-ও সেই কামিনী ছাড়া মান-অপমান লজ্জা-ভয় প্রভৃতি সকলই ভুলিয়া যায়; তাহারও হিতাহিত বিবেচনা অন্তর্হিত হইয়া যায়। সেই কামিনীর জন্য সে না পারে বা না করে, এমন কার্য্যই নাই। আজ সেই তুমি যখন বিশ্বম্ভর দাসকেও সাধুসেবার আকর্ষণে ফেলিয়া দিয়াছ, তখন তাহারই বা অসাধ্য কি আছে। পিতা হইয়া আপন হস্তে একমাত্র পুত্রের মস্তক-চ্ছেদন, ইহা কি আর অসম্ভব হইবে? কখনই না,—কখনই না। ঐ ঐ দেখ, বিশ্বম্ভরদাস দৃঢ়মুষ্টিতে অস্ত্র ধারণ করিল। ঐ ঐ দেখ, অস্ত্র উত্তোলন করিল। ঐ ঐ দেখ, পুত্রের গলদেশে সজোরে আঘাত করিল। ঐ ঐ দেখ, উত্তপ্ত শোণিতের উৎস উত্থিত হইল। আহা অনুরাগ, ঐ ঐ দেখ, অহো! আমরা আর দেখিতে পারি না, দেখাইতেও পারি না, কেবল তুমিই দেখ,—ঐ ঐ দেখ, পিতার নিষ্ঠুর অস্ত্র-প্রহারে পুত্রের মস্তক দেহচ্যুত হইল। আরও কিছু দেখিবে কি? দেখিতে পারো তো দেখ,—ঐ ঐ দেখ, পিতা বিশ্বম্ভর দাস দুই হস্তে দুইটি ঘৃত ভাণ্ড লইয়া—আর কক্ষে রঘুনাথের রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ড চাপিয়া রাখিয়া চঞ্চলচরণে চলিয়াছে। কোথায় চলিয়াছে জান কি?—সেই তুমি যাহাদিগের আকর্ষণে তাহাকে ফেলিয়াছ, সেই সাধুদিগের সমীপেই বিশ্বম্ভর চলিয়াছে। অহো, অনুরাগ, ধন্য—ধন্য তোমার মহিমা!!

বিশ্বম্ভরদাসকে লইয়া দৈব যে খেলা জুড়িয়া দিয়াছেন, এতক্ষণে তাহা বেশ জমিয়া আসিয়াছে। বিশ্বম্ভরদাস ত্বরিতপদে গৃহে ফিরিয়া

আসিলেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী এতক্ষণ কেবল ঘর-বাহির করিতেছিলেন। একটু খুট করিয়া শব্দ হইলেও তিনি চকিতনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিলেন,—ঐ বুঝি পতিপুত্র আসিতেছেন। এমন সময় বিশ্বম্ভরদাস তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একা পতিকে আসিতে দেখিয়া মায়ের প্রাণ উড়িয়া গেল, পুত্রের অকল্যাণ আশঙ্কায় তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন, বিশেষত স্বামীর সেই গুরু-গম্ভীর ভাব—সেই রুধিররঞ্জিত কলেবর দর্শনে তিনি যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। মনে করিলেন, একবার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি,—ওগো তুমি যে একা-একাই ফিরিয়া আসিলে, আমার রঘুনাথ কই? কিন্তু কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিল, তিনি মুখ ফুটিয়া একটি কথাও কহিতে পারিলেন না। তাঁহার শরীর থরথর কাঁপিতে লাগিল।

পত্নীর অবস্থা বুঝিয়া বিশ্বম্ভরদাস তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা তাঁহার কাছে বর্ণনা করিলেন। পুত্রের কর্ত্তিত মস্তক কক্ষ হইতে বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং উত্তমরূপে লুকাইয়া রাখিতে বলিয়া দিলেন।

পতিব্রতা রেবতী যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকারময় দেখিলেন। এককালে যেন শতসহস্র বজ্র আসিয়া তাঁহার মস্তকে দারুণ আঘাত করিল। বিষম ব্যথায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে গেলেন, কিন্তু হায়! তিনি একটু কাঁদিতেও পারিলেন না। তাঁহাকে যে গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে নাই,—তিনি যে আজ চোরের মা! চোরের মাকে কি

ডাকিয়া কাঁদিতে আছে? অহো! তাঁহাকে বুকভরা দুঃখ-সন্তাপ বুকেই চাপিয়া রাখিতে হইল।

সতীর এ ভাব কিন্তু অধিকক্ষণ রহিল না। পতিব্রতার স্বাভাবিক ভাব তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, বিশ্বম্ভর দাস আমার পতি, আর আমি হইতেছি তাঁহার সহধর্ম্মিণী। পতির অতিথিসেবা পরম ধর্ম্ম, তাঁহার সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমার সর্ব্বতো-ভাবে সহায় হওয়াই আবশ্যক। পুত্রশোকের যথেষ্ট সময় আছে, এখন পতির ধর্ম্মই রক্ষিত হউক। আর পুত্রই বা কি, তাহাও তো পতির অনুগ্রহেই পাইয়াছি। পতিই সতীর একমাত্র গতি,—সেই পতিরই ধর্ম্ম রক্ষিত হউক।

পতিভক্তির প্রবল আবেগে পতিব্রতার পুত্রশোক তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায় উড়িয়া গেল। তাঁহার মুখকমল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি হাসিতে-হাসিতে বিশ্বম্ভরদাসকে বলিলেন,—স্বামিন্, আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র সাধুগণকে ঘৃত প্রদান করুন।

বিশ্বম্ভরদাসও মহানন্দমনে সাধুগণের নিকটে ঘৃতভাণ্ড লইয়া গমন করিলেন এবং বিলম্বজনিত অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে ঘৃত প্রদান করিলেন। সাধুগণও ঘৃত পাইয়া পরমানন্দে পাকভোজনাদি সমাধানপূর্ব্বক বিশ্বম্ভরদাসকে বলিলেন,—রাত্রি অধিক হইয়াছে, বাবা তুমি ঘরে যাও, ভগবান্ তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন।

সাধুবৃন্দের চরণে প্রণাম করিয়া বিশ্বম্ভরদাস আপন গৃহে আগমন করিলেন। পতি-পত্নী উভয়েই সে রাত্রে একটুও

ঘুমাইতে পারিলেন না। পুত্রের অগণিত গুণ এবং শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম চিন্তা করিতেকরিতেই তাঁহাদের রাত্রি কাটিয়া গেল।

এদিকে সেই বড়লোকের বাড়ীতে মহা হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। সে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার দেখে কে? রাত্রি প্রভাত হইতে-না-হইতে সেই মুণ্ডহীন শরীরটা সদর রাস্তার মাঝে ফেলিয়া মহা হাঁকডাক আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দেখিতেদেখিতে কাতারেকাতারে লোক জড় হইয়া গেল। এ ওকে ঠেলে, সে তাকে ঠেলে, সেই ধড়টি সকলেরই সর্ব্বাগ্রে দেখিবার ইচ্ছা। দেখিলও শতশত লোকে, কিন্তু কাহার যে ধড়, তাহা কেহই সনাক্ত করিতে পারিল না। কেবল বৃথা তর্ক ও কথা-কাটাকাটিতেই সে স্থানটা কোলাহলময় হইয়া উঠিল। তখন সেই ধনবান্ সেই খণ্ডিত দেহটিকে গ্রামের বাহিরে লইয়া গিয়া শূলের উপর চাপাইয়া দিলেন। সেখানেও অনেক লোক জড় হইয়া গেল। যে দেখিল, সে-ই ধড়টির উপর নানাপ্রকার গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিল,—কেহকেহ বা অঙ্গভঙ্গী সহকারে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করিতে থাকিল। মুণ্ডহীন পিণ্ড লইয়া রঙ্গরস কতক্ষণই বা চলিতে পারে? বেলাও অধিক হইতে লাগিল, যে যাহার গৃহ-অভিমুখে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

এদিকে আবার সাধুবৃন্দ বিশ্বম্ভরদাসের নিকট বিদায় লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিলেন,—বিশ্বম্ভর দাস! ওহে ও বিশ্বম্ভর দাস! শীঘ্র বাহিরে আইস, আমরা আর অধিকক্ষণ থাকিব না।

বিশ্বম্ভরদাস তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। আসিবার সময়

পত্নীকে বলিয়া আসিলেন, আমি সাধুগণের সমীপে যাইতেছি, তুমি রঘুনাথের সেই মুণ্ডটি লুকাইয়া লইয়া আইস। আমি সেটি সাধুসকলকে দেখাইব, তাহার পর একান্ত স্থানে ফেলিয়া দিব। পত্নীও স্বামীর আজ্ঞা পালন করিলেন,—পুত্রের মুণ্ডটি আনিয়া স্বামীর হস্তে অন্যের অলক্ষিতে অর্পণ করিলেন। বিশ্বম্ভরদাসও সেই মুণ্ডটি কক্ষে চাপিয়া রাখিয়া ধীরেধীরে সাধুগণের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

সাধুসমূহ বিশ্বম্ভরদাসকে প্রীতিভরে বলিয়া উঠিলেন,—বৎস, তোমার সেবায় আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তুমি সর্ব্ববিধ কল্যাণের অধিকারী হও। তবে আমরা এখন আসি?

বিশ্বম্ভরদাস তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলেন,— ঠাকুর! আপনাদের যাহা ইচ্ছা, আমি আর কি বলিব। বিশ্বম্ভরের বিনয়-বচনে সাধুবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেকরিতে চলিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভরদাসও তাঁহাদিগকে একটু আগু বাড়াইয়া দিবার অছিলায় তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে থাকিলেন। এইরূপে কিছুদূর যাইবার পর সাধুগণ বিশ্বম্ভর দাসকে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন,—হাঁ হে বিশ্বম্ভর, তোমার পুত্র রঘুনাথ কোথায়? তাহাকে যে সঙ্গে আন নাই? কল্য রাত্রে সে আমাদের অত সেবা-শুশ্রূষা করিল, অত আদর-আপ্যায়ন করিল, আর আজ তাহার একবারও দেখা নাই? তুমি যাও, শীঘ্র রঘুনাথকে লইয়া আইস, আমরা তাহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া তবে বিদায় লইব; নচেৎ আমরা এই স্থানেই থাকিয়া যাইব।

সাধুগণের কথা শুনিয়া বিশ্বম্ভর মুখে আর কিছুই বলিলেন না।

কেবল ছলছলনেত্রে সাধুগণের দিকে চাহিয়াই রহিলেন। দরদর অশ্রুধারে তাঁহার বদন-বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বিশ্বম্ভরের অশ্রুদর্শনে সাধুগণের সহজকরুণ হৃদয় গলিয়া গেল। তাঁহারা ব্যথিত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন,—বাবা বিশ্বম্ভর! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার দুঃখবিপত্তির কথা অকপটে আমাদিগের কাছে বল, কোন ভয় নাই, আমরা তাহার প্রতিকার করিব। ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভরদাস আপন কক্ষ হইতে রঘুনাথের মুণ্ডটি বাহির করিলেন এবং সেটি সাধু-গণের পদপ্রান্তে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। উঠিয়া কৃতাঞ্জলি করযুগল কপালে রাখিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—ঠাকুর, এই,—এই দেখুন আমার পুত্র রঘুনাথ। হায় প্রভু, বিধাতার লিপি অখণ্ডনীয়—অখণ্ডনীয়!

দেখিয়া-শুনিয়া সাধুসকল যেন ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ভাবিলেন,—বুঝি কোন দুষ্ট লোক রঘুনাথের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছে। তাই রোষকষায়-নেত্রে তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—বিশ্বম্ভর, শীঘ্র বল, কে তোমার পুত্রের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিল? আমরা এখনই সেই পাষণ্ডের সমুচিত দণ্ড প্রদান করিব,—তাহার বংশ নির্ব্বংশ করিয়া দিব।

শুনিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন,—প্রভু, ইহাতে অন্য কাহারও কিছুই দোষ নাই, দোষ আমারই—আমার দগ্ধ অদৃষ্টেরই। বলিয়া বিশ্বম্ভর সেই তাঁহাদের জন্য ঘৃত চুরি করিতে যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে সকল কথাই বর্ণনা করিলেন। শেষে বলিলেন,—

"ভাগ্যে মুঁ অরিজিচ্ছি যাহা। অবশ্য ভুঞ্জিবই তাহা॥"

সাধুবৃন্দ বিশ্বম্ভরের, তাঁহার পত্নী ও পুত্রের অতিথিভক্তি, ধর্ম্মরক্ষার্থে দেহাদিতে অনাসক্তি প্রভৃতি দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন এবং প্রীতিভরে বলিয়া উঠিলেন,—বৎস, তোমার জীবন ধন্য, তোমরা পত্নীর জীবন ধন্য, তোমার পুত্রেরও জীবন ধন্য। তোমরা নশ্বর দেহের বিনিময়ে সেই অবিনশ্বর বস্তু অর্জ্জন করিবার প্রকৃত অধিকারী। তোমাদের জয় হউক। আমাদের অবস্থান-কালের মধ্যে যে তোমার পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, ইহাও দৈবের খেলা বলিতে হইবে। চল তোমার পুত্রের মুণ্ডহীন দেহ যে স্থানে আছে, তুমি সেই স্থানে আমাদিগকে লইয়া চল, কোন চিন্তা নাই, তোমার পুত্র পুনর্জীবন লাভ করিবে;—যাহার প্রাণে এত বিমল ধর্ম্মভাব—এত ভগবানে ভালবাসা, তাহার বিনাশ নাই—অকালমৃত্যু তাহার হইতেই পারে না। চল বিশ্বম্ভর চল, তোমার পুত্র জীবন লাভ করুক,—যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমার যশে ভুবন ভরিয়া রহুক।

ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভরদাস, সেই গ্রামের বাহিরে—যেথানে শূলের উপর পুত্রের শিরোহীন শরীর স্থাপিত, সেখানে সাধুগণকে লইয়া গেলেন। তাঁহারাও শূলের উপর হইতে শবশরীরটী নামাইয়া সকলে মিলিয়া ঘিরিয়া বসিলেন। তার পর সেই ছিন্ন মুণ্ডটি ধড়ের সহিত জুড়িয়া দিলেন। তাহার উপর তুলসীদল অর্পণ করিলেন এবং ভক্তিগদ্গদ-ভাবে বলিতে লাগিলেন,—

"বোইলে—ধর্ম্ম যেবে সত। নিশ্চয় বন্ধু এ বালুত॥
প্রভুমহিমা যেবে সত। পুরাণ যেবে হেব তথ্য॥

যে প্রাণী পর-উপকারে। কি অবা হরিভজনরে ॥
কি দীনরক্ষণনিমন্তে। কি অবা সাধু সেবা-অর্থে ॥
অনলে পশিলেক যাই। ত্রাহি করন্ত ভাবগ্রাহী ॥”

যদি ধর্ম্ম সত্য হয়, এ বালক নিশ্চয় জীবন লাভ করিবে প্রভুর মহিমা যদি সত্য হয়, পুরাণ শাস্ত্র যদি প্রকৃত হয়, তবে এ বালক নিশ্চয় জীবন লাভ করিবে; যে ব্যক্তি পরের উপকার করে, কিংবা হরিভজনে নিরত থাকে, অথবা দীনজনের রক্ষণের নিমিত্ত কিংবা সাধুসেবার জন্য বিপদের অনলে আত্মসমর্পণ করে, ভাবগ্রাহী ভগবান্ তাঁহাকে ত্রাণ করেনই করেন।

এই কথা বলিতে-বলিতে সাধুগণের সে এক ভাবই আলাদা হইয়া পড়িল। তাঁহারা তাঁহাদের হৃদ্বিহারী শ্রীহরিকে লক্ষ্য করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—ভগবন্, এ বালক মরিবে কেন? শরণাগতের রক্ষক—ভবভয়ের বজ্রবর্ম্ম তুমি থাকিতে এ বালক মরিবে কেন? মহিমময়, তোমার অপার অনন্ত মহিমা তো জগতে নিয়ত প্রচারিত রহিয়াছে, তাহা তো আর মিথ্যা বলিবার যো নাই; তাই বলি প্রভু, তোমার সেই মহিমার গুণে এই বালক জীবন লাভ করুক। আর যদি এ বালকের জীবন না-ই দাও, তবে এই লও নাথ! আমাদের সকলের জীবন তোমার চরণতলে উৎসর্গ করিলাম। আহা প্রভু, ঐ বালক যে আমাদেরই জন্য আপন জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। গোবিন্দ হে, এই পূতচিত্ত শিশুটিকে রক্ষা কর প্রভু—রক্ষা কর।

সংসারের লোকে ধন-বল, জন-বল, দেহ-বল প্রভৃতি কত বলেরই কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু সাধুসজ্জন কখনও সে সকল বলকে ‘বল’

বলিয়াই মনে করেন না। তাঁহাদের বল সেই সর্ব্ববলে বলীয়ান্ ভগবান্ —আর তাঁহারই স্বরূপভূত তাঁহার নানাবিধ নাম। তাই সাধুগণ তখন বারংবার সেই ভগবানেরই নাম বদন ভরিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সেই সমুচ্চ নামধ্বনিতে সকল সংসার যেন নামময় হইয়া উঠিল। সেই নাম সংসার ছাড়াইয়া সুদূর ভগবদ্রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গেসঙ্গে ভক্তবৎসল ভগবানেরও আসন টলিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তো আর তাঁহার স্থির হইয়া থাকিবার যো নাই। তাই তিনি তখনই অলক্ষিত ভাবে তথায় আগমন করিলেন। আর সেই বালকের জীবন দান দিয়া অলক্ষিতেই চলিয়া গেলেন। এ ব্যাপার অন্য কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না, কেবল বুঝিলেন তাঁহারাই, যাঁহারা আর সকল ছাড়িয়া কেবল সেই ভগবান্‌কে লইয়া মজিয়া আছেন।

দেখিতেদেখিতে বালক রঘুনাথ উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার মুখোচ্চারিত মধুর হরিধ্বনিতে চারিদিক্ ভরিয়া গেল। তিনি সাধুবৃন্দের চরণে,—পিতার চরণে বারবার প্রণাম করিলেন। সে দেশের লোক ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল, আহা এ বালকের জীবন ধন্য,—ইহাকে দর্শন করিলেও লাভ আছে। সাধুগণেরও আনন্দ আর ধরে না। তাঁহারা সেই বালককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—বৎস, তোমার মনটি বড় ভাল, তাই তুমি ভগবানের কৃপায় এই নবজীবন লাভ করিয়াছ। পূর্ব্বজীবনে তোমার নাম ছিল

রঘুনাথ, এ জীবনে তোমার নাম হইল ‘সুমন’। আমরা তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি অন্তে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিবে। বৎস, এখন যাও, তোমার পিতার সহিত জননীর নিকটে যাও, তাঁহার তাপিতপ্রাণে শান্তির শীতল ধারা ঢালিয়া দাও।

এই কথা বলিতে-বলিতে সাধুবৃন্দ দেখিতে-দেখিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। পিতাপুত্রও ক্ষণকাল যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে সাধুগণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। রঘুনাথ দ্বারদেশে আসিয়াই একবার ‘মা’ বলিয়া ডাকিলেন। স্বর্গের সুধা মিষ্ট কি সেই স্বর মিষ্ট, একথা লইয়া আমাদের তর্ক চলিতে পারে, কিন্তু রেবতীর কর্ণে তাহা সুধা অপেক্ষাও সুমধুর বলিয়া বোধ হইল। তিনি আলুথালুভাবে বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলেন, পতির পার্শ্বে তাঁহার প্রাণের পুতলী রঘুনাথই বটে! আনন্দের আবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি ধাইয়া গিয়া তাঁহার রঘুনাথকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। কাহারও মুখে কথাটি নাই। কথা হইল নয়নে-নয়নে। যেমনই নয়নে-নয়নে মিলন,—নয়নে-নয়নে সম্ভাষণ, অমনই নয়নে-নয়নে আনন্দের অমল জল পল্‌পল্‌ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল,—উত্তপ্ত মরুসৈকতে সুশীতল সলিলের ফোয়ারা ছুটিল।

বন্ধু মহান্তি।

"দিদি! মা কোথা গেল? বড় খিদে পেয়েছে।"

"মাকে তো ভাই! দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। কাঁদলে কি হবে; চুপ কর ভাই! চুপ কর, মা এখনই এসে খেতে দেবে এখন।"

"আমার পেট যে জ্বলে-জ্বলে উঠ্‌ছে দিদি! আমি যে আর থাক্‌তে পাচ্ছিনে দিদি! কাল সবে একটু ফেন খেয়েছি বই ত নয়?"

"কি কর্‌বো ভাই! আমারও তো ঐ দশা। আমরা তবু একটু ফেন পেয়েছি, মা আবার তা-ও পান নাই। না খেয়ে খেয়ে মার মাইয়ের দুধ নেই, খুকীটে কেঁদেকেঁদে অস্থির হ'য়ে পড়েছে।"

"বাবা কোথায় দিদি! না হয় তাঁকেই খাবার কথা বল না! ক্ষুধায় যে আর বাঁচিনে দিদি!"

"বাবাও সেই খাবারের যোগাড়েই বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন। চুপ কর ভাই! চুপ কর। বাবা এলেই খেতে পাওয়া যাবে এখন।"

উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরের এক জীর্ণ কুটীরে বসিয়া দুইটী ভাই-ভগিনীতে ঐরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল। ভগিনী বড়, বয়স সাত বৎসর; ভাইটি তাহার অপেক্ষা বছর তিনেকের ছোট। ইহাদের আরও একটি ছোট ভগিনী আছে, তাহার বয়ঃক্রম সবে এক বৎসর হইবে। পিতা বন্ধু মহান্তি ভিক্ষাজীবী। আজ আনিলে কাল খাইবার আর ঘরে কিছু থাকে না। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া যে দিন যাহা মিলে, বন্ধু তাহাতেই সন্তুষ্ট; তাহাই পতিব্রতা

পত্নীর হস্তে আনিয়া দেন। তিনিও তাহা হইতে অতিথিসেবাদি নির্ব্বাহ করেন, বালক-বালিকাকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া কিছু থাকিলে পতি-পত্নী দুইজনে ভোজন করেন। দেখিতে যেন বড় কষ্টের সংসার, কিন্তু পতি-পত্নীর মনে ক্লেশের লেশও নাই। তাঁহারা যথালাভেই সতত সন্তুষ্ট। ঈশ্বরে অচল বিশ্বাস ও প্রগাঢ় প্রীতিই তাঁহাদের হৃদয়কে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের ভক্তই তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দেবতা। ভগবানের নামই তাঁহাদের মহামন্ত্র। ভগবান্ এবং ভক্তের উচ্ছিষ্টই তাঁহাদের উপাদেয় আহার। ভগবান্ এবং ভক্তের পাদোদকই তাঁহাদের সর্ব্বব্যাধিনাশক মহৌষধি। তাই সঞ্চয়-সম্বলহীন দরিদ্র ভিখারী হইয়াও পতিপত্নী ধনীর ধনী—মহাধনী। তাঁহাদের জীর্ণ কুটীর, ছিন্ন কন্থা, শতগ্রন্থি বস্ত্র ও রুক্ষ দেহের আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, আনন্দ বুঝি আর কোথাও নাই, সকল আনন্দই বুঝি ইহারা একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছেন। এই আনন্দের সংসারে নিরানন্দ কখনও দেখা দেয় নাই; দেবতার রাজ্যে সয়তান কখনও হুম্‌কি দেয় নাই। কিন্তু চিরদিন তো আর সমান যায় না। প্রকৃতির নিয়মই যে তা নয়। এ রাজ্যে দিনের পর রাত্রি আছে, জোয়ারের পর ভাঁটা আছে, বসন্তের পর বর্ষা আছে; সুখের পর দুঃখও আছে। তাই এই শান্তির সংসারেও অশান্তি আসিয়া দেখা দিয়াছে। শিশুর হাস্যমুখরিত সংসার আজ ক্রন্দন-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ। কাহারও দ্বারে ভিক্ষা মিলে না। অন্না-

ভাবে সকলেরই দেহ কঙ্কালসার। গবাদি পশুর আহারের দায়ে চালের খড়গুলি পর্য্যন্ত ফুরাইতে বসিয়াছে। মাঠে ঘাস নাই, গাছে পাতা নাই, পুকুরে পানা নাই; মানুষেই তাহা খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর চুরি ডাকাতি ও মহামারি এই ত্র্যহস্পর্শ আসিয়া দেখা দিয়াছে। আর রক্ষা নাই। যেদিকে চাও, দেখিবে রাশিরাশি মড়া; যেদিকে কাণ পাতো, শুনিবে কেবল হৃদয়ভেদী হাহাকার ক্রন্দন। শকুনি-গৃধিনীতে আকাশমার্গ পরিপূর্ণ। শৃগালগণ দিবাভাগেই শবশরীর লইয়া টানাটানি করিতেছে। পচা দুর্গন্ধে চারিদিক্ ভরিয়া গিয়াছে। অমুক আজ সাতদিন উপবাসী, অমুক আজ কচি ছেলের হাত হইতে একটি মুড়ি কাড়িয়া খাইয়াছে, অমুক আজ অভুক্ত শিশু পুত্রের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, অমুক আজ উপবাসী পরিবারবর্গের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া দেশান্তরী হইয়া চলিয়া গিয়াছে, অমুক আজ কুকুরের মাংস খাইয়াছে, অমুক নাকি আজ জঠরজ্বালায় মড়ার মাংসও আহার করিয়াছে, এইরূপ কথাই কেবল মুখে-মুখে আলোচিত। বড়ই ভীষণ সময়, চারিদিকেই বিষাদের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতি রাক্ষস-রাক্ষসীগণ যেন লোল রসনা বিস্তার করিয়া উন্মত্ত ভৈরব এবং রণরঙ্গিণী চণ্ডিকার ন্যায় এই মহাশ্মশানে তাণ্ডবনৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে। এই ভীষণ দৃশ্য ভাবিলেও হৃদয় দুরুদুরু করিয়া উঠে। বন্ধু মহান্তির আনন্দসাম্রাজ্যেও এই দুর্ভিক্ষদানব উঁকিঝুঁকি মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ তিনদিন তাঁহারা পতিপত্নীতে উপবাসী। ভিক্ষা জুটিতেছে না, সামান্য যাহা জুটিয়া-

ছিল, বালকবালিকা দুইটীরই তাহা পর্য্যাপ্ত হয় নাই। কোলের মেয়েটিতো কেন খাইয়াই আছে। গত কল্য বাসি ফেনে শিশুদের দিন গুজরান হইয়াছে। আজ ভাগ্যে তাহাও জুটে নাই, তাই বন্ধু মহান্তির কন্যা পুত্র দুইটীতে ঐরূপ কান্নাকাটী করিতেছে।

বন্ধু মহান্তি অনেক গ্রাম ঘুরিয়া হয়রাণ হইয়া এইমাত্র ফিরিয়া আসিলেন। একটি দানা চাউলও কোথাও মিলে নাই। একমুষ্টি শাকপত্রও তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। নিজের জন্য নয়, শিশু পুত্রকন্যার জন্যই যেন একটু চিন্তিত হইয়া বাহিরবাটীতে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আহা, তাঁহার কোলের মেয়েটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা ধরাইয়া ফেলিয়াছে। বাছা আমার শুষ্ককণ্ঠে আর কাঁদিতে পারিতেছে না, কেবল থাকিয়া-থাকিয়া ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া উঠিতেছে, আর মার প্রতি এমন করুণ নয়নে চাহিতেছে যে, দেখিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। আহা ঠাকুর! তুমি না বড় দয়াল, তোমার রাজ্যে এ কঠোর শাসন কেন? হায়, মা অন্নপূর্ণার অন্নসত্রে এ দারুণ দুর্ভিক্ষ কেন? বাবা বৈদ্যনাথের রাজত্বে এ মহামারি কেন? এ রহস্যের উচ্ছেদ কে করিবে!

খুকীকে কোলে করিয়া পত্নী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার নয়নে দরদর অশ্রুধারা; দেখিয়া বন্ধু মহান্তিও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। কাতর-কণ্ঠে বলিলেন,—সতি! শ্রীহরির কি যে ইচ্ছা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, উপবাসক্লিষ্ট শরীরে যতদূর পারি গ্রামেগ্রামে ঘুরিয়া আসিলাম, একটি

তণ্ডুলও কোথাও পাইলাম না। শাকপাতাও কোথাও চক্ষে ঠেকিল না। তাই বসিয়াবসিয়া ভাবিতেছি,—লীলাময় হরির এই লোকসংহারিণী লীলা আর কতদিন চলিবে? এ লীলা সংবরণ কর প্রভু! তোমার সৃষ্ট জীব, তুমি না রাখিলে আর কে-ই বা রক্ষা করিবে? ঠাকুর! এই মর্ম্মপীড়ক দৃশ্য চর্ম্মচক্ষেই আমরা দেখিতে পারি না, আর তুমি তোমার করুণার প্রস্রবণ নয়নে কেমন করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছ নাথ! এ লীলা সংবরণ কর প্রভু! সংবরণ কর।

পতির মুখে 'ভিক্ষায় কিছুই মিলে নাই' শুনিয়া পত্নীর মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। পতির পদতলেই বসিয়া পড়িলেন এবং বিনাইয়া-বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন,—হায় নাথ! আমি না হয় অভাগিনী, শৈশবেই মাতা পিতা হারাইয়াছি, আত্মীয় বন্ধু বলিতে কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না যে, তুইদিন তাহাদের বাড়ীতে গিয়া এই অকালটা কাটাইয়া আসি, কিন্তু হাঁগা, তুমিও কি আমারই মত? তোমারও কি আত্মীয়কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব সথাসাঙ্গাৎ কেহই নাই? নিকটে হউক দূরে হউক, যদি কেহ থাকে তো বল, ছেলেপুলে লইয়া সকলে তথায় চলিয়া যাই, উভয়ে প্রাণপণে তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা করি, আর এক মুষ্টি অন্ন খাইয়া জীবন রক্ষা করি। তা না হ'লে বাছাদের আর বাঁচাইতে পারিব না, নিজেরাও মারা যাইব।

বন্ধু মহান্তি পত্নীর কথার প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিলেন,—সতি! না, আমারও তেমন আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই। তবে

একজন বন্ধু আছেন বটে, তিনি কিন্তু থাকেন বহু দূরে। এখান-থেকে পাঁচদিনের পথ হইবে। বন্ধুটী বড় ভাল।—

"পুরুষমানঙ্ক উত্তম। কেহি সুহৃন্তি তাঙ্কু সন॥
আবর ভাগ্যবন্তপণে। ব্রহ্মাণ্ডে নাহিঁ অন্যজনে॥"

আমরা যদি তাঁহার কাছে যাইতে পারি, তাহা হইলে সকল ক্ষুধাই চিরতরে মিটিয়া যাইবে। আহা, তাঁহার নামটি বড়ই মিষ্ট। তাঁহার নাম,—দীনবন্ধু। আমাদের মত দীনহীনকে তিনি বড়ই ভাল বাসেন।

শুনিয়া সতীর আনন্দ আর ধরে না। তিনি মহা ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে বলিলেন,—নাথ, হউক পাঁচদিনের পথ, চল সেইখানেই চলিয়া যাই, দীনবন্ধুর দরবারে গিয়া দারিদ্র দুঃখ দূর করিয়া ফেলি। নাও খোকাকে তুমি কাঁধে কর, আমি ছোটখুকীকে কোলে করিয়া লই, বড়খুকী চলিয়া যাইতে পারিবে এখন; আর জিনিষটা পত্রটা যাহা লইতে হয়, তাহাও আমিই বহিয়া লইয়া যাইব। নাও, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। ঘরে একটু তোড়ানি (আমানি) আছে, সেইটুকু খোকা-খুকিদের খাওয়াইয়া দেই, তুমিও মোটঘাট বাঁধিয়া তৈয়ারি হও। নাও, আর বিলম্ব কোরো না। পাঁচটা দিন বই তো নয়, পথে ঘাসপাতা খাইতে-খাইতে পরমানন্দে চলিয়া যাইব এখন। তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই।

বন্ধু মহান্তি ঈষৎ হাসিয়া ইঙ্গিতেই পত্নীকে সম্মতি জানাইলেন। সতীও প্রস্তুত হইয়া আসিতে গৃহমধ্যে গমন করিলেন। বন্ধু

মনেমনে ভাবেন,—প্রভু! যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখন একদিন-না-একদিন মরিতেও হইবে; তাহার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিতও নহি। মৃত্যুভয়ে দেশত্যাগ, সে তো বাতুলেরই কর্ম্ম। মৃত্যু নাই কোথা? তোমার পাদপদ্ম ছাড়া এমন কোন্ স্থান আছে, যেখানে মৃত্যু নাই? এখান ছাড়িয়া যেখানেই পলাই না কেন, মৃত্যু আমায় কিছুতেই ছাড়িবে না, সে আমার পাছু ধরিয়াই চলিবে। তবে আমি মৃত্যুভয়ে পলাইব কেন? ঠাকুর! তুমি বিশ্বম্ভর; কোথায় জলের ভতর পর্ব্বত, তাহার মধ্যে কোথায় একটি ক্ষুদ্র কীট রহিয়াছে, তাহারও রোজ-আহারের খবর যখন তুমি রাখিয়া থাক, তখন সেই আহারের দায়েই বা দেশান্তরী হইতে যাইব কেন? দেওয়া-না-দেওয়ার মালিক তো তুমিই। তা এখানেই দাও, আর অন্য কোথাওই দাও। তোমার ইচ্ছা হয় তো ঘরে বসিয়া-বসিয়াই একমুষ্টি পাইব, ইচ্ছা না হয় তো সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হইয়াও চুঁটকি-ভিক্ষা জুটিবে না। তবে আবার দেশত্যাগ করিতে যাই কেন? 'যাই কেন?'—তাহা কি আর বলিতে হইবে? যাই,—তোমার জন্য,—তোমার সেই মদনমোহন মূরতি দেখিবার জন্য? হায় নীলাচলনাথ! সে দিন—সেই শুভদিন কি হইবে?—বলভদ্র-সুভদ্রার সহিত কি তোমার পাদপদ্ম দর্শন ভাগ্যে ঘটিবে? যদি ঘটে, তাহা হইলে মনে করিব, দুর্ভিক্ষ-দানবই আমার বন্ধু—বন্ধুর অপেক্ষাও বন্ধু—পরম বন্ধু। মনে করিব,—সে-ই আমায় বিষের মধ্যে অমৃতের অবস্থান দেখাইয়া দিল;—সে-ই আমায় অমঙ্গলের

আমারে তোমার সর্ব্বমঙ্গল শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাৎকার করাইয়া দিল। হউক,—নাথ! তাহাই হউক, আশীর্ব্বাদ কর, তাহাই হউক। নীলাচলে গিয়া যেন তোমার চন্দ্রবদন দর্শন করিতে পারি।

পত্নী, পুত্রকন্যাদের লইয়া সাজিয়া গুজিয়া পতির নিকট হাজির হইলেন। তিনি আর মোটঘাট বাঁধিবেন কি, সামান্য দুই-একটা জলপাত্র ও কাঁথাকম্বল লইয়া তৈয়ারি হইলেন। পুত্রকে কাঁধের উপর বসাইলেন, আর হরি হরি বলিয়া যাত্রা করিলেন। পত্নীও ছোট-মেয়েটি কোলে লইয়া পতির অনুগমন করিতে লাগিলেন। বড়-মেয়েটি তাঁর সঙ্গেসঙ্গেই হাঁটিয়া চলিল।

দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, পথিমধ্যেও ভিক্ষা বড় জুটিল না। শাকপাতা খাইয়াই তাঁহাদিগকে চারিদিন চালাইতে হইল। পঞ্চম দিবসে সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে শ্রীমন্দির দর্শনেই বন্ধুর ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইয়া গেল। আনন্দ-গদগদ-স্বরে তিনি পত্নীকে বলিয়া উঠিলেন,—সতি! ঐ দেখ আমার বন্ধু দীনবন্ধুর দেউল দেখা যাইতেছে। শুনিয়া তিনিও যেন শরীরে নূতন বল পাইলেন; এইবার পুত্র-কন্যার প্রাণ রক্ষা হইবে ভাবিয়া নবীন আশায় যেন তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল, মলিন বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আহা, শুষ্ককণ্ঠে আর তাঁহার বাক্য বাহির হইল না, ভাবভঙ্গীতেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন মাত্র। দেখিতেদেখিতে তাঁহারা সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দে আর এ পথটুকু আসার ক্লেশ তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না, যেন কোন যাদুমন্ত্রে তাঁহাদের এ পথটুকু কেহ লইয়া

আসিল। সিংহদ্বারে আসিয়া দেখেন, বেজায় ভিড়। পটাপট বেত চলিতেছে। ভিতরে যায় কাহার সাধ্য? বন্ধু মহান্তি শিশুদের লইয়া আর ভিড়ের মধ্যে যাইতে সাহসী হইলেন না; দূর হইতেই পতিত-পাবন দেবকে দর্শন করিয়া চর্ম্মচক্ষু সার্থক করিলেন। দেউলের দক্ষিণদিকের 'পেজনালা'র (ফেন বাহির হইবার নর্দ্দামার) পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। একে অনশনে অবসন্ন দেহ, তাহার উপর দারুণ পথক্লেশ, সিংহদ্বারে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকা কিছুতেই চলিল না। কাতর শরীরে পেটের কথা মুখ ফুটিয়া কাহারও বাহির হইতেছিল না; ক্ষণেক বিশ্রামের পর সকলেরই মুখে কথা ফুটিয়া উঠিল। পত্নী বলিলেন,—স্বামিন্! বন্ধুভবনে আসিয়া এ ভাবে এই পেজনালার পার্শ্বে গোরুর দলের মধ্যে বসিবার দরকার? ঐ দেখ, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নিবিড় অন্ধকার এখনই আকাশ-মেদিনী ছাইয়া ফেলিবে। তখন আবার পুত্র-কন্যাদের লইয়া কাহার দ্বারে আশ্রয় লইতে যাইব বল? তুমিই না হয় একবার বন্ধুর নিকট যাও, কিছু খাবারদাবার চাহিয়া আন, ছেলে-পুলেরা খাইয়া জীবন রক্ষা করুক; নচেৎ এখন পেজপানী (ফেন) চাহিতে যাই কাহার কাছে?

এমন সময় বড়খুকী ও খোকা কাঁদিতেকাঁদিতে মার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল,—মাগো! বড় ক্ষুধা পেয়েছে, প্রাণ আর বাঁচে না যে মা? কিছু খেতে দে মা, খেতে দে।

বন্ধু মহান্তি বলিলেন,—সুন্দরি! আমাদের আসাটা বড় অসময়েই হ'য়েছে। এ সময় বন্ধুর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া ভার। বিশেষত

আজ নানা দেশ হইতে তাঁর আরও অনেক বন্ধু এসেছেন তাঁদের ভিড়ে দেউলে ঢোকাও কঠিন। জোর করিয়া ঢুকিতে গেলে বেত খাইয়াই মরিতে হইবে। তার চেয়ে পেজপানী পান ক'রে আজি-কার রাত্রিটা এইখানেই কাটাইয়া দেওয়া যাউক; প্রাতঃকালে নিরিবিলিতে বন্ধুর সহিত দেখা করিয়া দুঃখ-দারিদ্রের কথা বলা যাইবে এখন।

পত্নীও তাহাতে সম্মত হইলেন। বলিলেন;—আচ্ছা তাহাই হউক, এখন পেজপানী (ফেন) তো আন, পান করিয়া প্রাণরক্ষা করা যাউক। বন্ধু মহাস্তি পথ হইতে একটি এঁটো কুড়ুআ (মাটীর ভাঁড়) কুড়াইয়া আনিলেন, আর পেজকুণ্ডে (ফেনের চৌবাচ্চায়) বুড়াইয়া-বুড়াইয়া পত্নীর হস্তে দিতে লাগিলেন। তিনিও পুত্রকন্যা-দের পান করাইয়া নিজেও উদর পূরিয়া পান করিয়া তথায় শুইয়া পড়িলেন।

বন্ধু মহাস্তি তখন তুষ্টমনে তাঁহার বন্ধুরই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। মনে-মনে বলেন,—

"বোইলা—নমো দারুহরি। চর-অচরে অচ্ছ পূরি॥
সকল জীবে পড়িদাতা। তুম্ভহুঁ—নাহিঁ না করতা॥
মুঁ এথুঁ তুহই বাহর। তু নাথ! যাহা ইচ্ছা কর॥
প্রভু! এঠারে কলে হেলা। বুড়িলা চিন্তা-জলে ভেলা॥
ক্ষুধা-অনলে পাঞ্চজনে। পোড়ি মরুচ্ছু অকারণে॥
তোর করুণাবারি দেই। শীতল কর ভাবগ্রাহি॥"

ওহে দারুহরি! তোমায় নমস্কার। তুমি এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপিয়া রহিয়াছ। তুমিই সকল জীবের সমস্ত বাঞ্ছিত দান করিয়া থাক।

ধরিয়া রাখিয়াছি। ভক্তের উপহৃত হৃদয়—হৃদয় ছাড়া আর কোন্‌খানেই বা রাখিব বল? আমার আদেশ,—তুমি কল্যই একখানি স্বর্ণপদক প্রস্তুত করাইতে চাও, তাহার মধ্যে এই পত্রখানি অতি সন্তর্পণে রাখিয়া দিয়া সোণার শিকলীতে সংলগ্ন করিয়া আমার গলায় ঝুলাইয়া দিতে চাও। আদেশ সত্বর প্রতিপালন কর তো উত্তম, নচেৎ তোমার মঙ্গল নাই। এই বলিয়া জগন্নাথ অন্তর্হিত হইলেন। মহাপাত্রেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখেন, কেহই কোথাও নাই। যাই হউক, তিনি আর শয্যায় থাকিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। অতি প্রত্যূষেই স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। স্বপ্নের কথা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া রহিয়াছে। তাই তিনি প্রভুর শ্রীরূপ না দেখিয়া অগ্রে হৃদয়ের দিকেই চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না! ধন্য ভগবানের ভক্তবাৎসল্য, ভাবিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন অশ্রুপূর্ণনয়নে দারুহরির বদন পানে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—দয়াময়! আমি মহা অপরাধী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আগে তো জানিতাম না যে, তোমার ভৃত্যের প্রতি এতই করুণা। তোমার ভক্তের বা ভক্তপ্রীতিরই প্রভাব বলিতে হইবে, তোমার ভক্ত কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্রের ক্ষণিক সংসর্গ পাইয়াছিলাম বলিয়াই আজ আমার মোহান্ধকার বিদূরিত হইয়া গেল, তোমার এবং তোমার ভক্তের মহিমোজ্জ্বল মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। নাথ! কই এতদিন তো তোমায় দেখিয়াও দেখিতে পাই নাই। তোমার ভক্ত

কৃষ্ণপ্রিয়ার পরম্পরা-সম্বন্ধেই আমার এই সৌভাগ্যের উদয় হইল। ঠাকুর! ধন্য তুমি, তোমার ভক্তও ধন্য ধন্য। যাঁহাদের পরম্পরা-সম্বন্ধের এত প্রভাব, তাঁহাদের সাক্ষাৎ-সংবন্ধের কথা তো চিন্তা-পথেই আনিতে পারি না। হায় প্রভু! আমি মহা মূর্খ, মহা অজ্ঞান, আমার অপরাধ ক্ষমা কর ক্ষমা কর। আমি এখনই তোমার স্বপ্নের আদেশ প্রতিপালন করিতেছি, আমার ক্ষমা কর নাথ! ক্ষমা কর।

বন্ধু মহাপাত্র এইরূপে জগন্নাথের অনেক স্তবস্তুতি করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তার পর শ্রীপ্রভুর গলদেশ হইতে সেই পত্রখানি খুলিয়া লইলেন এবং ঠিক সেই মাপের একখানি সুবর্ণপদক গড়াইয়া তাহার মধ্যে পত্রখানি পূরিয়া স্বর্ণহারে গ্রথিত করিয়া দয়াময়ের গলায় পরাইয়া দিলেন। ভক্তাধীন ভগবানের শোভা যেন তাহাতে শতগুণ বর্দ্ধিত হইল;—পদকের ছলে ভক্তের অপরিসীম প্রশংসার সুবর্ণপদক ভগবানের বক্ষে জলজল্ জ্বলিতেলাগিল।

পর-পর ঠাকুর! পদক পর। ও পদক তোমারই গলায় সেজেছে ভাল, তুমিই পর। তোমার ভক্ত যে মানমর্য্যাদা চায় না,—স্তুতি-প্রশংসার ধার ধারে না, সে কি দিলেও পদক গলায় ঝুলাইত? সে পরিবে না বলিয়াই তো তুমিই পরিয়াছ,—ভালই করিয়াছ; পর-পর পদক তুমিই পর। পরিতেই বা ক্ষতি কি আছে? তাতে তোমাতে তো আর তফাৎ নাই,—তোমাদের যে হৃদয়ে-হৃদয়ে মরমে-মরমে জড়াজড়ি। তাই বলি, পদক তুমিই পর;—সেজেছে ভাল তুমিই পর।

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি।

ভক্তের জয়।

পূর্ব্ব-ভাষ।

জয় দিই কার?—ভক্ত না ভগবানের? ইহার উত্তরের জন্য বড়-একটা ভাবিতে হয় না। স্বয়ং ভগবানইত শ্রীমুখে বলিয়াছেন—'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের ভাষাতেই ইহার অনুবাদটা শুনাইয়া দিই,—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥"

তাই আমরা ভক্তের জয় ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলাম। এক কাজে দুই কাজই হইয়া গেল। ভগবানের জয় দিলে বোধ হয় শুধু ভগবানেরই জয় ঘোষণা করা হইত, কিন্তু ভক্তের জয়ে—ভক্তেরও জয়,—ভগবানেরও জয়।

ভক্তচরিত্রের ছত্রেছত্রে ভক্তের অপ্রতিহত প্রভাব প্রকাশিত;—ভগবানেরও ভক্ত-প্রীতির পূত-প্রবাহ প্রবাহিত। আর সেই ভক্ত-চরিত্র লইয়াই ভক্তের জয় দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত। আমাদের এ 'ভক্তের জয়'ও সেই ভক্ত-চরিত্র লইয়া।

পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় রীতিমত ভক্তমাল ছিল না। নাভাজীর হিন্দী ভক্তমাল ও তাহার প্রিয়াদাসের হিন্দী টীকা অবলম্বন করিয়া বাঙালী লালদাস (অপর নাম কৃষ্ণদাস) বাংলা পদ্যে ভক্তমাল গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহা ছাড়া রীতিমত ভক্তমাল এদেশে আর নাই। উৎকলদেশে একখানি ভক্তমাল উৎকল ভাষায় প্রচারিত আছে। তাহার নাম "দার্ঢ্য-ভক্তি-রসামৃত"। আমাদের দেশে উক্ত গ্রন্থ-

তাহার ভাল লাগল [illegible] অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। অথচ ঐ চরি[illegible]

ঘরে আসিলেন। তালা-চাবি[illegible] দেখিতে পাওয়া [illegible]নীয়ান্' (স্বপ্নের

দেশবাসীকে ঐ চরিত্রগুলি শুনাইবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বাংলা ভাষায় তাহার প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভক্ত-চরিত্র প্রকাশের ভাষা আমার আয়ত্ত না থাকিলেও আশা আছে, ভবিষ্যতে কোন উপযুক্ত ভক্ত কবি পুষ্পিত ভাষায় ইহার সৌন্দর্য্য-সুষমা ফুটাইয়া তুলিবেন এবং কবিত্ব-গন্ধে দেশবাসীকে পরমানন্দিত করিবেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থে আটটী ভক্ত-চরিত্র প্রকাশিত হইল। ইহার মধ্যে সাতটী সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় এবং একটী (দামোদর দাস) প্রসিদ্ধ মাসিক 'অবসর' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বন্ধুবান্ধবের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এই আটটী চরিত্রে এক খণ্ড প্রকাশ করা গেল। সাধারণের আগ্রহ বুঝিতে পারিলে অন্যান্য চরিত্রগুলিও ক্রমশ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

শেষ একটী কথা বলিয়া রাখি, আমি উৎকল-ভক্ত-চরিত্রের আক্ষরিক অনুবাদ করি নাই। আমাদের দেশের রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া—আমাদের ছাঁচে সেগুলিকে ঢালিয়া লইয়াছি। তজ্জন্য উৎকল-চরিত্রের কিছুকিছু কাটছাঁট অদলবদলও করিতে হইয়াছে। চরিত্র-চিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ সাধন এবং ভক্তিরসের পরিপোষণের জন্যও স্থানেস্থানে অনেক কথা জোড়াতাড়া দিতে হইয়াছে। ভাল হইয়াছে—কি মন্দ হইয়াছে, জানি না, তবে 'উৎকল-বার্ত্তা' প্রভৃতি উৎকল ভাষার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে আমার লিখিত এই ভক্ত-চরিত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক উদ্ধৃত করায়, ইহা যে তাঁহাদের অনুমোদিত, তাহা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি।

শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা
শ্রীগৌরাব্দ ৪২৫
...নাথ গোস্বামীর লেন,

ভক্ত-চরণ-রেণু-প্রার্থী
শ্রীঅচ্যু

এ জগতে তুমি ছাড়া আর কর্ত্তাও স্বতন্ত্র কেহ নাই। আমি তো সেই জগতের বাহিরের লোক নই, আমাকে ঠেলিলে চলিবে কেন? নাথ হে! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কিন্তু মনে রাখিও, আমার বিষয়ে হেলা (উপেক্ষা) করিলে চিন্তার জলে আমার জীবন-ভেলা বুড়িয়া যাইবে। ওহে ভাবগ্রাহি জনার্দ্দন! আমরা পাঁচটী প্রাণী ক্ষুধার অনলে অকারণে পুড়িয়া মরিতেছি, তুমি তোমার করুণার বারিধারা ঢালিয়া তাহা শীতল কর প্রভু!

বন্ধুর শরীরটা পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, কিছু-ক্ষণ এইরূপ বলিতে-বলিতেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। এদিকে শ্রীজগবন্ধুর সমগ্র সেবা সরিয়া গেল। 'বড় সিংহার' বেশ হইল, পুষ্পাঞ্জলি দেবতা (ক্ষুদ্র ধাতুমূর্ত্তি) আসিলেন, পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইয়া গেল, শয্যা বিছানো হইল, প্রভুরা শয়ন করিলেন, ভাণ্ডারী ভাণ্ডারগৃহ বন্ধ করিয়া ফেলিলেন, মুদুলী পণ্ডা মন্দিরদ্বারে দড়ি বাঁধিয়া তাহার উপর মাটী দিয়া সেই মাটীতে 'মুদ' (মুদ্রা—মোহর—ছাপ) করিয়া দিলেন। মশালপ্রদীপ জ্বালিয়া শ্রীমন্দিরের 'বেড়া' (চারিদিক) 'শোধ' (জনশূন্য) করা হইল। চারিদিকের কপাট পড়িয়া গেল। প্রথমে শিকল দিয়া তার পর তালা দিয়া বন্ধ করাও হইল। সেবকগণ যে যাহার ভবনে চলিয়া গেলেন। দেউলে জনমানব নাই। ভক্তবৎসল ভগবানও ভৃত্যের চিন্তায় বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। সুকোমল শয্যায় শয়ন, কমলাদেবীর সাগ্রহ-সেবন আর তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া বরাবর ভাণ্ডার-ঘরে আসিলেন। তালা-চাবিতে আর সেই 'অণোরণীয়ান্' (সূক্ষ্মের

অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম) ভগবানের কি আসিয়া যাইবে ? তিনি ভাণ্ডার হইতে রত্নথালী বাহির করিলেন। তাহাতে অন্ন-ব্যঞ্জন, খাজা-গজা, পুরী-কচুরী, ক্ষীর-সর, পিষ্টক-পরমান্নাদি প্রসাদ স্তরেস্তরে সাজাইলেন। আহা, এগুলি প্রভু অভুক্ত বন্ধুর জন্য আগেআগেই সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। দয়াময় স্বয়ং সেই রত্নথালী বহিয়া লইয়া দক্ষিণ-দ্বারে গমন করিলেন। দ্বার খুলিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—বন্ধু ! ও বন্ধু !

ডাক শুনিয়া বন্ধুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু তিনি মনে করিলেন,—এ পুরীসহরে কি 'বন্ধু' নাম আর কাহারও থাকিতে নাই ? এ হয় তো আর কাহাকেও কেহ ডাকিতেছেন। আর যদি প্রভুই হন তো এখনই বুঝা যাইবে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়াই দেখি না কেন ?

'বন্ধু ! বন্ধু !' ডাক শুনিয়া তাঁহার পত্নীও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং পতির প্রতি কহিতে লাগিলেন,—ওগো ঐ শুনগো তোমায় কে ডাক্‌ছে। বন্ধু বলিলেন,—কোথায় কে ডাক্‌ছে ? 'বন্ধু' কি আর কেউ থাক্‌তে নেই ? নাও শুয়ে পড়।

পত্নী কি করেন, আবার শুইয়া পড়িলেন। বন্ধু মহান্তিও কাণ খাড়া করিয়া শুইয়াই রহিলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ বন্ধুর হৃদয় বুঝিলেন ; উচ্চৈঃস্বরে আবার ডাকিতে লাগিলেন। এবার আর শুধু 'বন্ধু' বলিয়া নয়,—এবার ডাক দিলেন,—ওহে ও যাজপুরিয়া বন্ধু, ঐ যে পেজনালার পার্শ্বে সপরিবারে শয়ন করিয়া আছ, বন্ধু ও বন্ধু এদিকে এস ভাই ! এদিকে এস, আমি তোমার জন্য অন্নগ্রাস লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছি।

বন্ধু মহান্তির কর্ণে সেই জলদগম্ভীর স্বর প্রবেশ করিল। তাঁহার সর্ব্বশরীর পুলকপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আবার ভাবিলেন, সত্যই কি দীনবন্ধু আমায় ডাকিতেছেন, না, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি? স্বপ্নও তো নয়, ঐ যে আবার সেই স্বর শুনা যাইতেছে, ঐ যে শীঘ্র যাইবার জন্য আবার তিনি আহ্বান করিতেছেন। সেই সর্ব্বান্তর্যামী ছাড়া আর কে-ই বা জানিবেন যে, আমি যাজপুরবাসী বন্ধু মহান্তি ক্ষুধায় কাতর হইয়া সপরিবারে পেজনালার পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছি? না, তিনিই বটেন। যাই, কথাটা কি বুঝিয়া আসি।

বন্ধু মহান্তি শশব্যস্তে উঠিয়া দক্ষিণদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, একজন ব্রাহ্মণ রত্নথালী হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যাইবামাত্রই তিনি বলিলেন,—বন্ধু! এত দেরি করিয়া কি আসিতে হয়? ডাকিতে-ডাকিতে যে আমার গলা চিরিয়া গেল। এই দেখ অন্নথালীর ভারে আমার হাত থরথর কাঁপিতেছে। যাও ভাই! এই গ্রাসেক অন্ন খাইয়া আজিকার রাত্রিটা তো অতিবাহিত কর, কল্যই তোমার আহার-অবস্থানের সমস্ত বন্দোবস্তই করিয়া দিব। যাও, কোন চিন্তা করিও না; খাইয়াদাইয়া সুস্থ হওগে।

বন্ধু মহান্তি হাত বাড়াইয়া প্রভুর হস্ত হইতে রত্নথালী গ্রহণ করিলেন। শ্রীঅঙ্গস্পর্শে বন্ধুর শরীর অবশ হইয়া পড়িল। বলিবলি করিয়া তিনি একটি কথাও প্রভুকে বলিতে পারিলেন না। প্রভুও শ্রীমন্দিরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। বন্ধু মহান্তি কিছুক্ষণ জড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবেভাবে তাঁহার প্রাণ তোলপাড় করিয়া

তুলিয়াছে। তাঁহাতে আর যেন তিনি নাই। ক্ষণকাল পরে তিনি যেন মাতালের মত টলিতে-টলিতে পেজনালার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পত্নী-পুত্রাদিকে জাগাইলেন এবং সকলে সেই রত্নথালী ঘিরিয়া বসিয়া পরমানন্দে মহাপ্রসাদ ভোজন করিতে লাগিলেন। বন্ধু মহান্তি খাইতে বসিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার আর ক্ষুতাতৃষ্ণা ছিল না, পরমানন্দেই তাঁহার ভিতর-বাহির ভরিয়া গিয়াছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গেল। একটু জল সংগ্রহ করা ছিল, সেই জলে বন্ধুপত্নী রত্নথালীখানি ধুইয়া দিলেন। বন্ধুও সে খানি ফিরাইয়া দিবার জন্য দক্ষিণদ্বারে গমন করিলেন। গিয়া অনেক ডাকাডাকি—দ্বার-ঠেলাঠেলি করিলেন, কিন্তু কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না। কি করেন, অগত্যা ফিরিয়াই আসিলেন। একটু ছেঁড়া নেকড়া ছিল, তাহাই জড়াইয়া রত্নথালীখানি মাথার শিয়রে রাখিয়া দিয়া পুত্রকন্যাদের লইয়া বন্ধুপত্নী আবার শুইয়া পড়িলেন। শুইবামাত্র সকলেই ঘুমাইয়াও পড়িলেন। কিন্তু বন্ধুর আর শয়নও নাই, নিদ্রাও নাই। তাঁহার তখন এক অপূর্ব্ব অবস্থা; সে অবস্থাটা জাগা ও ঘুমের মাঝামাঝি, অথচ স্বপ্ন বা তন্দ্রাও নয়। সে অবস্থাটা—মোহালস্যের অতীত,—তামস-সুখের অতীত;—আত্মানন্দে আলোকিত কি-এক মাদকতাময়ী অবস্থা। সেই অবস্থায় থাকিয়া বন্ধু মহান্তি কত-কিই ভাবিতে লাগিলেন। প্রথম তাঁহার মনে হইল, এই যে রত্নথালী, এটি সাক্ষাৎ প্রভুর হস্তচ্যুত! এটি সামান্য রত্নথালী নয়; এটি সাক্ষাৎ সেই প্রভুই। বন্ধু থালীটি লইয়া একবার বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার প্রাণ

যেন জুড়াইয়া গেল। সাক্ষাৎ প্রভুর স্পর্শ পাইতেছি বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। বুক হইতে থালীখানি লইয়া তিনি নয়নে-বদনে ও মস্তকে চাপিয়া-চাপিয়া ধরিলেন, আনন্দ-মদিরার নেশা যেন আরও ঘোরাল হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার শরীর যেন অবশ হইয়া পড়িল। তিনি থালীখানি মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িলেন। মনে হইতে লাগিল, যেন প্রভুর পাদপদ্মের উপরই মাথা রাখিয়া শুইয়া আছি। আর তিনি যেন সোহাগভরে মুখে-বুকে পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিতেছেন, তৈলহীন সংস্কারহীন রুক্ষ জটাবাঁধা চুলগুলি ধীরেধীরে কুরিয়া-কুরিয়া দিতেছেন। চক্ষু তো বুঝিয়া ছিলই, এইবার যেন সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারেই কপাট পড়িয়া গেল। মনপ্রাণ সে কি-এক অপ্রাকৃত আনন্দে ভরপূর হইয়া গেল। ইহাকে নিদ্রা বলিতে হয় বল, আর সমাধি বলিতে হয় বল, কিন্তু বন্ধুর অবস্থাটা তখন ঐ বলি-বলি-বলা-যায়-না-ধরণেরই হইল।

এদিকে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, কাক-কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল। ঊষার অরুণরাগে চারিদিক লালেলাল হইয়া পড়িল। শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ স্নানসন্ধ্যা সমাপন করিয়া শুদ্ধভাবে শ্রীমন্দিরে আগমন করিলেন। দ্বার খোলা হইল। দেউলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলেই আপনআপন সেবায় লাগিয়া গেলেন। ভাণ্ডারী ভাণ্ডার খুলিয়া দেখেন যে, বাসন-কোসন যে ভাবে গোছান ছিল, সেভাবে নাই; কে সব ওলটপালট করিয়া ফেলিয়াছে। দেখিতেদেখিতে আরও দেখেন যে, সর্ব্বনাশ! প্রভুর রত্নথালী একখানি নাই! তিনি মহা হাঁকডাক ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন। ব্যাপার কি জানিবার

জন্য চারিদিক্ হইতে সেবক সকল ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। ভাণ্ডারী বলিলেন,—সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ, কল্য রাত্রে দেউলে ডাকাত পড়িয়াছে, প্রভুর রত্নথালী চুরি করিয়া লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। গোলমাল শুনিয়া প্রহরীরাও আসিয়া জুটিল। "দেউলের ভিতর চুরি ডাকাতি করিতে বাহির হইতে অন্য চোর কে আসিবে, এ কার্য্য সেবকদেরই,"—বলিয়া তাহারা সেবকদেব উপর চড়োয়া হইল। সে মারমার কাটকাট তর্জ্জনগর্জ্জন দেখে কে? শেষ যত দোষ গিয়া পড়িল বেচারা 'সোয়ার' (সূপকার) পণ্ডাদের উপর। সকলেই সিদ্ধান্ত করিলেন, রন্ধনের অনুরোধে তাহারা রাত্রে রন্ধনশালায় ছিল, একাজ ওদেরই হইবে, অন্য কাহারও নয়। ধর ওদেরই; রত্নথালী এখনই বাহির হইবে। আহা, প্রহরিগণ তাঁহাদের জোড়াজোড়া করিয়া বাঁধিয়া পিঠে পটাপট বেত মারিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাঁহাদের ক্রন্দনরোলে দেউলের ভিতরটা ভরিয়া গেল। এই কথা লইয়া সমগ্র পুরীসহর সরগরম হইয়া পড়িল।

দৈবেরই খেলা, যে রত্নথালীর জন্য এত কাণ্ড, এত হাঙ্গামহুজ্জত, এত নির্দ্দোষের নির্য্যাতন, সেই রত্নথালী মাথায় দিয়া বন্ধু মহান্তি মহানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছেন। নির্দ্দোষ বন্ধু মহান্তি কি আজ দৈবের এ খেলায় অব্যাহতি পাইবেন? না না, আজ আর তাঁহারও অব্যাহতি নাই। রত্নথালী আজ একটা মহা হুলস্থূল কাণ্ড না বাধাইয়া আর ছাড়িতেছেন না।

পেজনালার পার্শ্বে বন্ধু মহান্তি সপরিবারে শুইয়া আছেন। তাঁহার মাথায় সেই ছেঁড়া নেকড়াতে বাঁধা রত্নথালী। ছেঁড়া

নেকড়ার ফাঁক দিয়া রত্নথালীর চক্‌চকানি দেখা যাইতেছে। বিশেষতঃ সূর্য্যকিরণে তাহার জলুষ যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাহা একজনের নজরে পড়িয়া গেল। আর যায় কোথা, সে মহা গোলমাল করিয়া লোক জড় করিল, আর লম্ফঝম্ফ করিতেকরিতে বলিতে লাগিল,—পাকড়াও পাকড়াও বেটাকে; রাত্রে চুরি ক'রে বুঝি চম্পট দিবার সুযোগ পায় নাই, তাই বেটা মট্‌কা মেরে এইখানে প'ড়ে আছে। ধর, ধর বেটাকে, শীগ্‌গির শীগ্‌গির ধর, নইলে বেটা এখনই পলাইয়া যাইবে।

বলাও যা, আর অমনি জন-সাতেক লোক লাফ দিয়া গিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল। বন্ধুরও আনন্দনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখেন,—বিপরীত কাণ্ড! 'ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞাসা করিবারও আর তিনি অবসর পাইলেন না। কতকগুলি লোক তাঁহার মাথার নীচে হইতে থালীখানি জোরে ছিনাইয়া লইল, কতক লোকে তাঁহার হাতে-পায়ে শিকলী দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, তার উপর যে যত পারিল—চড়চাপড়টা ঘুষীঘাষাটা বসাইতে লাগিল। আর গালাগালির তো অবধিই নাই, সে যেন শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় চারিদিক হইতে বর্ষণ হইতে থাকিল।

বন্ধু মহান্তির দুর্দ্দশা দেখিয়া স্ত্রীপুত্রাদি কান্নার হাট বসাইয়া দিলেন। বন্ধু কিন্তু অচল অটল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া 'গোবিন্দ গোবিন্দ' করিয়া উঠিতেছেন, আর সেই তাড়ন-ভর্ৎসন অকাতরে সহ্য করিতেছেন। এ শরীরের সহিত যেন তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই,—এ শরীরের সুখদুঃখে বুঝি তাঁহার কিছুই করিতে পারে না।

প্রহার-তিরস্কারের বেগ একটু কমিয়া আসিলে বন্ধু তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—'ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। আপনারা মারুন, গালাগালি দিউন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন; কিন্তু আমারও দু'একটা কথা আপনাদিগকে শুনিতে বলি।'

"হাঃ, বেটা চোর, ওর কথা আবার শুন্‌তে হবে?"—এই বলিয়াই অনেকে বন্ধুর কথা উড়াইয়া দিলেন। ভাল-মন্দ সব রকমেরই তো লোক আছে, তাই কেহ বা বলিলেন,—ভাল, ও কি বলিতেছে একবার শোনোই না কেন?

বলিবার হুকুম পাইয়া বন্ধুও তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'মহাশয়গণ! আমি বিদেশী। গতকল্য এখানে আসিয়াছি। পথ-শ্রমে কাতর হইয়া স্ত্রী-পুত্রাদিসহ এইখানেই পড়িয়াছিলাম। প্রবল ক্ষুধায় শিশুসন্তানগণ কাঁদিয়া অস্থির। একটু পেজপানী ভিন্ন অন্য আহার আর জুটে নাই। করা যায় কি, পড়িয়া-পড়িয়া পতিতপাবন প্রভুকেই ডাকিতেছিলাম। রাত্রি দশদণ্ড হইবে, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া দক্ষিণদ্বার হইতে আমায় ডাকিলেন। আমি তাঁহার কাছে গেলাম। তিনি এই রত্নথালী ভরিয়া নানাপ্রকার খাদ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা সকলে মিলিয়া পরমানন্দে তাহা আহার করিলাম। পরে থালীখানি ফিরাইয়া দিতে গিয়া দেখি, দ্বার বন্ধ; কেহই কোথাও নাই। অনেক ডাকহাঁক করিয়াও যখন সাড়াশুড়ি পাইলাম না, তখন কাজেকাজেই ফিরিয়া আসিতে হইল। তাই ঐ ভাবে ছেঁড়া নেকড়া জড়াইয়া থালীখানি রাখিয়া দিয়াছি। সত্য কথাই আপনাদের নিকট বলিলাম। এখন বলুন, আমার অপরাধ কি?'

বঙ্কুর স্ত্রীও তাঁহাদিগকে ঐরূপ কথাই বলিলেন, কিন্তু তাহাতে বড় একটা কাহারও বিশ্বাস হইল না। অনেকেই বলিয়া উঠিল,—"ব্যাটাবেটির কথা শোন দেখি, রাত্রি দশদণ্ডের সময় ওদের জন্য রত্নথালী কোরে কে ব্রাহ্মণ আবার খাবার দিতে এসেছেন? বেটাকে বন্দিশালে নিয়ে চল, দুদিন ঠাণ্ডা গারদে থাকিলেই সব ভণ্ডামী ভেঙ্গে যাবে এখন।" দুষ্টের দল চিরদিনই পুষ্ট। তাহারা বঙ্কু মহান্তিকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া বন্দিশালায় লইয়া গেল এবং গারদঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিল। বঙ্কুর পত্নী ও পুত্রকন্যা পেজনালার পার্শ্বেই পড়িয়া রহিলেন। আহা তাঁহাদের করুণ ক্রন্দন শুনিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়।

বঙ্কুকে বন্দিঘরে দিয়া, গালাগালি দিতে দিতে প্রায় সকলেই আপন-আপন গৃহে চলিয়া গেল। যাইলেন না কেবল দুই চারিজন। তাঁহারা বঙ্কুর পত্নী-পুত্রাদিকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—বাছা! তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমরা এইখানেই থাক, আহারাদি আমরাই জোগাইব। সত্যের জয় অবশ্যই হইবে, তিনি সত্বর কারা-মুক্ত হইবেনই হইবেন। বলিয়া তাঁহারা ছেলেদের জন্য কিছু খাবার দিয়া চলিয়া গেলেন।

কারাবদ্ধ বঙ্কুর হস্ত-পদ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ। একটু নড়িবার-চাঁড়বার যো নাই। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার অণুমাত্র চাঞ্চল্য বা ক্লেশানুভব নাই। তিনি আনন্দমনে সেই দীনবন্ধুরই পাদ-পদ্ম ভাবিতে লাগিলেন। এত অপমান এত তাড়ন-তিরস্কার পাইয়াও তাঁহার মনোমধ্যে একবারও এ ভাবের উদয় হয় নাই

যে, ঠাকুর! কাল যে রাত্রিকালে তুমি বলিলে—কল্যই তোমার আহার-আবাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিব, এই অজস্র গালা-গালিই কি আমার আহার, আর কারাবাসই কি আমার আবাস নিরূপিত হইল প্রভু!

এরূপ অবস্থায় তোমরা-আমরা হইলে বোধ হয় এর চেয়েও বেশী রকম দুই-চারিটা কড়া কথা না শুনাইয়া আর ছাড়িয়া দিতাম না। তা তিনি ভগবানই হউন, আর যিনিই হউন। কিন্তু বন্ধুর মনের কোণেও এ ভাবের কথা একবারও উঁকিঝুঁকি মারে নাই। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী, তার উপর কর্ম্মফল মানেন। তাই তিনি সুচতুর কর্ণধারের ন্যায় কর্ম্মের শত ঝঞ্ঝাবাত শত তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়াও অবিচলিতভাবে দেহ-তরণী চালাইয়া চলিয়াছেন। বিপদ দেখিয়া তাঁহার ভয় বা চাঞ্চল্য হইবে কেন? তিনিও যে তাঁহার ধ্রুব নক্ষত্র—তাঁহার কম্পাসের কাঁটা ভগবানের দিকেই দৃষ্টি স্থির রাখিয়াছেন।

তোমার যদি শুনিবার কাণ থাকে তো ঐ শুন, কারাবদ্ধ বন্ধু মনেমনে কি বলিতেছেন। বন্ধু বলিতেছেন,—

"বোলে— মুঁ পাপী অপরাধী। তুম্ভে যে করুণাবারিধি॥
ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পাপিজনে। মো-পরি নাহিঁ অন্যজনে॥
তো-পরি পতিত-তারণ। অছি কে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেণ॥
এণু তু যাহা কলে কর। অন্য শরণ নাহিঁ মোর॥"

ঠাকুর! আমি বড়ই পাপী, বড়ই অপরাধী; সেই পাপের ফলেই আমার এই নির্য্যাতন। ইহাতে তোমার কিছুই দোষ নাই;

কেননা তুমি যে করুণার সাগর। প্রভু! এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আমার মত পাপী ব্যক্তি আর দুইটি নাই। কিন্তু তোমার মত পতিত-তারণই বা কে আছেন? তাই বলি নাথ! তুমি যাহা করিতে হয় কর। কিন্তু জানিয়া রাখিও, আমার আর অন্য শরণ নাই। আশ্রয় বল, রক্ষক বল, তুমিই আমার সকলই।

ভক্ত এত ব্যাকুল ভাবে প্রভুকে ডাকিতেছেন, তাঁহার কি আর শান্তি আছে? অথচ নিত্য নিয়মিত সেবা না সরিলেও কিছু করিতে পারিতেছেন না। তিনি বড় ব্যতিব্যস্তেই পড়িয়া গেলেন। দেখিতেদেখিতে দিনটুকু কাবার হইয়া গেল। প্রভুর সন্ধ্যা-আরতি, সন্ধ্যা ধূপ (রাত্রিকার ভোগ), চন্দনলাগি (শ্রীঅঙ্গে চন্দনলেপন), বড়সিংহার (পুষ্পবেশ) ও পহুড় (শয্যায় শয়ন করানো) প্রভৃতি সেবাও ক্রমেক্রমে সরিয়া গেল। দেউলের 'বেঢ়া শোধ' করিয়া দ্বারে তালা দিয়া সেবকগণও চলিয়া গেলেন। প্রভুও সত্বর শয্যাত্যাগ করিয়া গরুড়ের উপর চাপিয়া গগনমার্গে গিয়া চড়িলেন; হুকুম দিলেন,—গরুড়! খোরধা (বর্ত্তমান খুরদা) রথি-পুরে প্রতাপরুদ্র রাজার প্রাসাদে শীঘ্র লইয়া চল। গরুড়ও 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সন্‌সন্ করিয়া বায়ুবেগে তাঁহাকে লইয়া চলিলেন এবং নিমেষমধ্যে প্রভুকে রাজভবনে পঁহুছাইয়া দিলেন।

গভীর রাত্রি। মহারাজ তখন অন্তঃপুরে পালঙ্কের উপর সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। ভাবগ্রাহী ভগবান্ ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়া সেই-খানেই গমন করিলেন এবং স্বপ্নমার্গে রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—ওহে রাউত! (রাজন্) আমার আজ্ঞা শ্রবণ কর। প্রথম একটা কথা

জিজ্ঞাসা করি, তোমার গৃহে যদি বন্ধুবান্ধব আসে, তবে কি তাহারা উপবাসী হইয়াই ফিরিয়া যায়? ইতর লোকের ঘরেও আত্মীয়কুটুম্ব আসিলে তাহাকে পেট কোলে করিয়া ফিরিয়া যাইতে হয় না? আর কোথায় যাজপুর, সেথান থেকে আমার একটী বন্ধু সপরিবারে আমার বাড়ীতে আসিয়াছে, আমিই তাহাকে আমার রত্নথালী করিয়া ভোজন করিতে দিই। তোর বাপের পুঁজিপাটা তো কিছু ভাঙ্গিতে যাই নাই, আমারই রত্নথালী আমি তাহাকে দান করিয়াছি। থালী খানি বন্ধুর কাছেই ছিল। আর তোর লোকজন কিনা তাহাকে 'চোর' অপবাদ দিয়া ধরিয়া লইয়া গেল? আহা, তাহার হাতে-পায়ে বাঁধিয়া মাটীতে ফেলিয়া যেমন মারিতে হয় মারিল, তার পর দুইটী পায়ে শিকলী লটকাইয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল। আহা, তাহার স্ত্রীপুত্রাদির দুর্দ্দশার কথা আর কি বলিব। বন্ধুর জন্ত তাহারা ব্যাকুলপ্রাণে হাহাকার ক্রন্দন করিতেছে। তাই আমি তোমায় আজ্ঞা দিতেছি, যদি মঙ্গল চাও তো সত্বর ক্ষেত্রে গমন কর। যাইয়া আমার বন্ধুকে কারামুক্ত করিয়া দাও, তাহার পায়ের শিকলী কাটাইয়া সেই পায়ের তলে পড়িয়া সম্মানিত কর। তার পর তীর্থজলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র পরাইয়া দাও এবং নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া দেউলের হিসাবরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত কর। কাহাকেও কোন নূতন কর্ম্মে বাহাল করিতে হইলে যেমন তাহার মাথায় 'শাড়ী' (শিরোপা) বাঁধিয়া দিবার প্রথা আছে, বন্ধুর মস্তকেও সেইরূপ 'শাড়ী' বাঁধিয়া দিবে। আর আজীবন যাহাতে উত্তম ভোজন লাভ করিতে পারে, তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া

দিবে। যাও, আর বিলম্ব করিও না। সত্বর আমার আদেশ পালন করগে। না কর তো জানিও, তোমার রাজ্যে আর মঙ্গল নাই। আমি কে, জান ত?—আমি সেই নীলাচলনাথ নারায়ণ।

ভগবান্ রাজাকে এই কথা বলিয়া, তাঁহাকে চেতাইবার জন্য 'সপাং' করিয়া এক ঘা চাবুক মারিয়া, গরুড়ে আরোহণ-পূর্ব্বক নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজাও উঠিপড়ি করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি বাহিরবাটীতে বিজয় করিলেন। পাত্র-মিত্রকে ডাকাইয়া সকল কথা বলিলেন। তখনই তাঁহার 'বারু লাগি' (বাহিরে যাইবার সাজগোজ) হইল। তিনিও নীলাচল অভিমুখে চলিলেন। তথায় পৌঁছাইতে তাঁহার বড় বিলম্ব হইল না। তিনি বরাবর বন্দিমন্দিরেই গমন করিলেন। কারাগৃহের দ্বার মুক্ত করাইয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। স্বপ্নাদিষ্ট সকল কথা হাতে-হাতে মিলাইয়া লইলেন। দেখিলেন, হাঁ যাজপুরবাসী জনৈক ব্যক্তি রত্নথালী চুরির অপরাধে কারারুদ্ধ রহিয়াছে বটে। তাঁহার আর অবিশ্বাস রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বন্ধুর পার্শ্বে গমন করিলেন। বন্ধনমোচনের জন্য প্রহরীদের আদেশ দিলেন। প্রহরিগণ বন্ধন মোচন করিল। মহারাজও পরমাদরে বন্ধুকে কোলে লইলেন, বুকে বুক লাগাইয়া বলিতে লাগিলেন,—অহো আমার জীবন ধন্য, বহু ভাগ্যে আজ তোমার বদন দর্শন হইল। আমার লোকজন তোমার কাছে বড়ই অপরাধ করিয়াছে, সে অপরাধ তাহাদের নহে, আমারই হইয়াছে। তোমায় তাহা ক্ষমা করিতেই হইবে।

বন্ধু মহান্তি বিনয়ের খনি। তিনি নৃপতিকে বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ! আমি অতি তুচ্ছ, অতি ঘৃণিত, সামান্য করণজাতি; আপনি এ মহাপাতকীকে স্পর্শ করিবেন না স্পর্শ করিবেন না। মহারাজ! আমার মত অপরাধী জগতে আর নাই। আপনিই আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন; আপনার আবার অপরাধ কিসের? আমায় ছুঁইবেন না ছুঁইবেন না, ছাড়িয়া দিউন ছাড়িয়া দিউন।

মহারাজ কিন্তু কিছুতেই ছাড়িলেন না। তিনি অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন। তীর্থজলে স্নান করাইয়া বসনভূষণে ভূষিত করিলেন। দেউলের হিসাবরক্ষক কার্য্যে নিয়োগসূচক তাঁহার মাথায় 'শাড়ী' বাঁধিয়া দিলেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদিকে আনাইয়া নানাপ্রকারে সম্মানিত করিলেন। দেউলের দক্ষিণ পার্শ্বে বাসভবনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বাসন-কোসন আসবাব-পত্র প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত হইয়া গেল। যাহাতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উপাদেয় প্রসাদ পাইতে পারেন, তাহারও লিখিত আদেশ দান করিলেন। পরে বহুমান সহকারে বন্ধুকে শ্রীমন্দিরে প্রভুর সম্মুখে লইয়া গিয়া সর্ব্ববিধ দানের সমর্পণ-পত্র (দলিল) তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। নৃপতির মনের ভাব,—ঠাকুর! এই দেখ তোমার সম্মুখেই তোমার আদেশ প্রতিপালন করিলাম, আর আমার অপরাধ নাই।

মহারাজ শ্রীজগবন্ধুকে প্রণাম করিয়া, বিনয়-বচনে বন্ধুর কাছে বিদায় লইয়া আপন ভবনে গমন করিলেন। ভক্তের প্রভাব ও

ভগবানের ভৃত্য-প্রীতি দর্শনে সকলেই ভক্ত ও ভগবানের জয় জয় করিতে লাগিলেন। মুখেমুখে চারিদিকে এ কথা প্রচার হইয়া পড়িল। কল্য যাহারা বন্ধুকে গালাগালি দিয়াছিল, প্রহার করিয়াছিল, দলেদলে তাহারা আসিয়া বন্ধু মহান্তির পদতলে পড়িতে লাগিল, ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকিল। বন্ধু জোড়হস্তে মানা করিলেও তাহারা আর মানা মানে না, বন্ধুর চরণ ধরিয়াই তাহারা বারবার ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে লাগিল। বন্ধু কিন্তু আপনাকে বড়ই অপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অত লোকের সঙ্গে একা আর পারিয়া উঠিলেন না বলিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলিতে কি, এই ব্যাপার দেখিয়া অনেক নাস্তিক-পাষণ্ডেরও প্রাণে আস্তিক্যবুদ্ধি আসিল; তাহাদের হৃদয়ও ভক্তিদেবীর অধিবাস-যোগ্য হইল।

বন্ধু! তোমার বন্ধু নাম সার্থক। তোমার পিতা-মাতা বোধ হয় সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন; তা না হ'লে তোমার বন্ধু নাম রাখিবেন কেন? ভগবান্ যাঁহাকে 'বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহার জীবন ধন্য। ভক্তবর! তোমার চরণে প্রণাম। এ জগতে আমরা কল্পনার দৃষ্টিতে অনেক বন্ধুই দেখিতে পাই, কিন্তু তুমিই যথার্থ বন্ধু দেখিয়াছিলে। যেমন তুমি, তোমার বন্ধুও তেমনই। কে ছোট, কে বড়, বুঝা ভার! দুঃখ-দারিদ্র্য দিয়া তিনি তোমাকে চিনাইয়াছেন। কতটা সহগুণ, কতটা দৃঢ়তা হইলে যে তাঁহাকে বন্ধু করিতে পারা যায়, তাহা তিনি তোমাকে দিয়াই বুঝাইয়াছেন। আবার সামান্য একটু ঐকান্তিক ভাবের বিনিময়ে

তিনিও যে কতটা করুণা বিস্তার করিয়া থাকেন, বন্ধু! তাহা তো তুমিই দেখাইয়া দিলে। এ জগতের স্বার্থপর বন্ধু যে বন্ধু নয়—তিনিই যে একমাত্র বন্ধু, তাহা তো তুমিই চিনাইয়া দিলে? তাই বন্ধু! তোমার চরণে বারবার প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন কোন-না-কোন জনমে তোমার মত দুঃখের দহন সহন করিয়া তোমার বন্ধু সেই জগবন্ধুকে বন্ধু করিতে পারি,—"হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে!"—বলিয়া তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক প্রণত হইতে পারি।

জগবন্ধু যাঁহার বন্ধু, তাঁহার আর অভাব কিসের, কষ্টই বা কিসের? বন্ধু মহান্তি পরম সুখে সপরিবারে সেই নীলাচলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই অবধি জগবন্ধুর আয়ব্যয়-হিসাব-রক্ষার কার্য্য তাঁহার বংশীয়েরাই করিতে থাকিলেন।

রঘু অরক্ষিত।

কে বলিল এ সংসারে সুখ নাই? কে বলিল স্বর্গেই কেবল সুধা মিলে? কে বলিল মরজগতে অমরধামের পারিজাত-সৌরভ সুদুর্ল্লভ? যাও—বঙ্গদেশে, হরিপুর সহরে—কৃষ্ণচন্দ্র মহাপাত্রের ভবনে, তোমার মনের সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে। তাঁহার পত্নী কমলাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতি-কথার প্রত্যুত্তর তাঁহারই কাছে পাইতে পারিবে।

কৃষ্ণচন্দ্র মহাপাত্র একজন মহা ধনশালী ব্যক্তি। সংসারে তাঁহার কিছুরই অভাব নাই,—হস্তিশালায় হস্তী, অশ্বশালায় অশ্ব, দাস-দাসী নায়েব-নফর কিছুরই অভাব নাই, অথচ তাঁহার প্রাণে কি যেন কিসের অভাব সতত বর্ত্তমান। অতিথি-অভ্যাগতের কলকল রবে তাঁহার অতিথিশালা সর্ব্বদাই মুখরিত, ধূপ ধূনা গুগ্‌গুলের পবিত্র সৌরভে ও স্তুতিগীতির মঙ্গল ধ্বনিতে তাঁহার দেবালয় সকল সর্ব্বদা পরিপূরিত, সকলের মুখেই তাঁহার প্রশংসা প্রচারিত, তথাপি তাঁহার প্রাণে যেন আকাশযোড়া [illegible] আসর লইয়া বসিয়া আছে। একা তাঁহারই যে এই দশা, তাহা নয়, পত্নী কমলারও অবস্থা পতিরই অনুরূপ। কমলার অত যে রূপ, সেই কি-এক সামগ্রীর অভাবে সে রূপও যেন দিনদিন উপিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন যায়, বিধাতার ইচ্ছায়, দম্পতীর হৃদয়ের অভাব যেন কতকটা শান্ত হইয়া আসিল,—কমলার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল।

দেখিতে-দেখিতে দশ মাস পূর্ণ হইয়া গেল। বহু ভাগ্যে আজ কমলা একটি পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন। পতিপত্নীর এতদিনের প্রাণের অভাব আজ একবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র মহাপাত্র আজ দুই হাতে করিয়া ধনরত্ন বিলাইতেছেন। আনন্দবাদ্যে ও দাতার জয়জয়রবে গৃহপ্রাঙ্গণ ভরিয়া গিয়াছে। আর কমলমুখী কমলা সদ্যোজাত শিশুকে কোলে লইয়া তাহার মুখচন্দ্র বারবার দেখিতেছেন, আর মনেমনে বলিতেছেন,—কে বলিল, এ সংসারে সুখ নাই? আজ আমাদের মত সুখী কে? কে বলিল স্বর্গেই কেবল সুধা মিলে? আহা, সুধা যে আমার শিশুর বিম্বাধরেই উছ-লিয়া পড়িতেছে। কে বলিল, নর-জগতে অমরধামের পারিজাত-সৌরভ সুদুর্ল্লভ? আমার বাছার অঙ্গগন্ধের কাছে ছার সে পারি-জাতের সুগন্ধ।

পিতামাতার সোহাগের শিশু দেখিতেদেখিতে পঞ্চম মাস অতি-ক্রম করিল। মহা সমারোহে তাহার নামকরণ ও অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। কুলপুরোহিতের নিদেশক্রমে শিশুর নাম হইল রঘুনাথ। একজন জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত আসিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিয়া গেলেন,-মহাপাত্র! তোমার পুত্রটি [illegible]ক্ত-অংশে জন্ম; কালে এ একজন মহাজন হইবে; দেখো যেন ইহার অযত্ন না হয়। অযত্ন হইবে? পিতামাতার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্রের অযত্ন হইবে, ইহা কি কখনও হইতে পারে? তথাপি ঐ দিন হইতে পিতামাতার আরও যেন একটু সতর্ক দৃষ্টি পুত্রের উপর পড়িল। ক্রমে-ক্রমে রঘুনাথ হামাগুড়ি দিতে, তার পর আলগোছা দাঁড়াইতে, তার পর চলিচলি

পা-পা করিয়া দু'চার পা চলিতে শিখিল। অল্পদিনের মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেও শিখিয়া ফেলিল। আর রক্ষা নাই, রঘুনাথ আর বাড়ীতে থাকে না, একটু ফাঁক পাইলেই একদৌড়ে ঠাকুরবাড়ী চলিয়া যায়। তথায় যাইলে তাহার আনন্দ যেন শতগুণ বাড়িয়া উঠে। সে কখনও ঠাকুরের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, কখনও তুলসীমঞ্চের চারিদিকে ঘুরিয়াঘুরিয়া বেড়ায়, আবার কখনও বা দুবাহু তুলিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য জুড়িয়া দেয়। শিশুর খেলা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, আর পরস্পর বলাবলি করে,—বাঁচে তো এ ছেলেটা একজন যথার্থ ভক্ত হইবে।

এইরূপে কিছুদিন যায়, রঘুনাথ আর এখন বালক নাই, সে ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। তাহার অঙ্গে-অঙ্গে আদ্য যৌবনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদিন কমলা স্বামীর কাছে পুত্রের শুভবিবাহের প্রস্তাব করিলেন। স্বামীও পরমানন্দে তাহাতে সম্মতি দিলেন এবং একটি পরমাসুন্দরী কন্যার জন্য দেশেদেশে ঘটক প্রেরণ করিলেন। কত দেশে কত পাত্রীই দেখা হইল, কিন্তু ঠিক মনের মত আর হয় না; অবশেষে মধ্যবাঙ্গালার কলাবতীপুরে গঙ্গাধর করণের কন্যা অন্নপূর্ণাই সকলের পসন্দসই হইল।

গঙ্গাধর করণ গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত না হইলেও কুবেরের মত ধনবান্ বলিয়াই বিখ্যাত। তাঁহার উপর্য্যুপরি সাতটী পুত্র, তাহার পর সবে মাত্র এই একটি কন্যা। অন্নপূর্ণা বাপমার বড়ই আদরের মেয়ে। রঘুনাথ যেমন সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পাত্র, অন্নপূর্ণাও

তাহার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পাত্রী। উভয় পক্ষের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল, বিবাহের দিন-লগ্নও অবধারিত হইল। শুভবিবাহের অন্তত একমাস পূর্ব্ব হইতে কৃষ্ণচন্দ্র ও গঙ্গাধরের ভবনে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইয়া গেল। নাচ গান বাজনা বাজিপোড়ানা প্রভৃতি আমোদপ্রমোদ পুরাদমে চলিতে লাগিল। দীয়তাং ভুজ্যতাং রবের তো আর বিরামই নাই। নিরূপিত দিনে শুভবিবাহও সম্পন্ন হইয়া গেল। রঘুনাথ অন্নপূর্ণাকে লইয়া গৃহে আসিল। বধূর মুখ দেখিয়া কমলার আর আনন্দ ধরে না। তিনি পুরন্ধ্রীগণের উলুউলু মঙ্গল ধ্বনির মাঝে বরকন্যা বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের গৃহ একা কমলার রূপের আলোকেই এতদিন আলোকিত ছিল, আজ আবার অন্নপূর্ণার রূপের আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

হইল সব,—সংসারী লোকে যাহা চায়—পুত্র পুত্রবধূ হইল সব, কিন্তু ভাগ্য তো কাহারও হাতধরা নয়, কৃষ্ণচন্দ্রের অদৃষ্টচক্রের কেমন আকস্মিক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। এত সুখ তাঁহার কপালে সহিল না। কয়েক বৎসর অজন্মায় জমিদারীতে শস্য ভাল জন্মায় নাই, প্রজাদের কাছে খাজনা আদায় হয় না, তাহার উপর তাঁহার দয়ার শরীর, পীড়ন করিয়া খাজনা আদায় দূরে থাকুক, বরং প্রজাবর্গের দুঃখ দেখিয়া তিনি অবিশ্রান্ত ঘর হইতে তাহাদের শস্য অর্থ জোগাইতে লাগিলেন। এইরূপে দেখিতেদেখিতে তিনি ক্ষীণবিত্ত হইয়া পড়িলেন। দেশের জমিদার বা রাজাই তিনি। মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য ব্যয়সংক্ষেপও করিতে পারেন না। কাজে-

কাজেই তাঁহাকে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতে হইল। ঋণের মত পাপ নাই। সেই মহাপাপ কৃষ্ণচন্দ্রের পুণ্যের সংসার অল্পদিনেই ছারখার করিয়া দিল। অবিশ্রান্ত দুশ্চিন্তায় কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। নানা ব্যাধি আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া তিনি পুত্র রঘুনাথকে নিকটে ডাকিলেন, তাহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া কাতরস্বরে বলিলেন,—"বাবা! আমি চলিলাম, আমার একটি কথা রাখিও, যতক্ষণ পারিবে ঋণ পরিশোধ করিবে, দেখো যেন কাহাকেও ফাঁকি দিবার কথা কখনও প্রাণে না জাগিয়া উঠে, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন।" কৃষ্ণচন্দ্র এই বলিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন। পতিব্রতা কমলা পুত্রের নিকটে বিদায় লইয়া পতির সহগমন করিলেন। রঘুনাথের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার অবস্থা ভাবিলেও কষ্ট হয়। আহা! তাহার মাতাপিতার শোক অনুভব করাও কঠিন হইয়া পড়িল। পাষাণহৃদয় পাওনাদারেরা তাহার গাত্রের মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা বড়লোকের আদরের মেয়ে। প্রায় পিত্রালয়েই থাকে। তাহার পিতা বা ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত কৃপণ-স্বভাব। তাঁহারা লোক-পরম্পরায় রঘুনাথের অবস্থা শুনিয়াও শুনিলেন না। রঘুনাথও সহজ ছেলে নহে, সে তাঁহাদের অপেক্ষা আরও অনেক গুণে বড়-লোকের খবর রাখিয়া থাকে, তাই সাহায্যভিক্ষার জন্য শ্বশুরবাড়ীর দ্বারের ত্রিসীমাও মাড়াইল না। যাহা কিছু বিষয়-বৈভব ছিল, তাহা দিয়া পিতার ঋণ পরিশোধ করিল। শ্বশুরবাড়ী হইতে যাহা যৌতুক-স্বরূপ পাইয়াছিল, তাহা পুরোহিতের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক দেবসেবার

বন্দোবস্ত করিয়া দিল এবং স্বয়ং ছিন্ন কন্থা ও কৌপীন সম্বল করিয়া গৃহের বাহির হইয়া পড়িল।

বিধাতারই লীলা। একটি বৃক্ষে দুইটী ফুল ফুটিতেছিল। আর অমনি কোথা হইতে দুরন্ত কালকীট আসিয়া তাহাদের বৃন্তে বাসা করিল। আহা! তাহাদের ভাল করিয়া ফুটিতেও দিল না; তাহারা অল্পবিস্তর সুষমা ছড়াইয়া, অল্পবিস্তর সৌরভ বিলাইয়া শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল। এইবার রঘুনাথ! তোমার ফুটিবার দিন আসিয়াছে, তুমি ফোট। তুমি ভগবানের ভক্ত—পদ্মজাতীয় পুষ্প; দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রচণ্ড তপনতাপেই তোমায় ফুটিতে হইবে; তুমি প্রস্ফুটিত হও! তোমার ঐ ছিন্ন মলিন বস্ত্রেই শৈবাল-সংবৃত পঙ্কজেরই মত তোমার শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে,—তোমার ভক্তি-সৌরভে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যাইবে। তোমার ফুটিবার দিন আসিয়াছে, ফোট রঘুনাথ! তুমি ফোট।

রঘুনাথ গ্রামেগ্রামে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কষ্টের আর অবধি নাই। বড়লোকের ছেলে। দুঃখ কাহাকে বলে জানিতেন না। একবারে এত কষ্ট সহিবে কেন? একদিন গভীর রাত্রে এক বৃক্ষতলে বসিয়া রঘুনাথ মনেমনে বিচার করিতে লাগিলেন,—আমি এইরূপ গ্রামেগ্রামে অকারণে ঘুরিয়া বেড়াই কেন? কেবল পশুর মত আহার-নিদ্রাতেই বা লাভ কি? তাহার অপেক্ষা এক কাজ করা যাউক,—কোন পুণ্যক্ষেত্রে চলিয়া যাই, আর সেইখানেই ভগবানের নাম লইয়া জীবন যাপন করি। তাই বা যাই কোথায়? শুনিয়াছি;—

"সকল জীবর করতা। ভগতি-মুকতির দাতা॥
কমলাদেবী-প্রাণপতি। দীনবান্ধব জগজ্জ্যোতি॥
বিজয় শ্রীনীলকন্দর। কম্বু-রথাঙ্গ ধরি কর॥"

যিনি সকল জীবের কর্ত্তা, ভক্তি ও মুক্তির দাতা, যিনি কমলা-দেবীর প্রাণপতি, দীনের বন্ধু ও জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি শঙ্খচক্র ধারণ করিয়া শ্রীনীলাচলে বিরাজ করিতেছেন। ভাল, সেইখানেই চলিয়া যাই। সেই প্রভুর সম্মুখে যাইয়া সকল দুঃখ-ক্লেশের কথা বলি। তারপর যাহা করিবার তিনিই করিবেন। আর কিছু না হউক, সাক্ষাৎ কৈবল্যস্বরূপ মহাপ্রসাদ ভোজন তো ভাগ্যে ঘটিবে? যদি তাহাই না-ই জুটে—অনশনেই মরি, তাহাতেও ত দুঃখ নাই; সেই মহাপুণ্যক্ষেত্রে মরিলেও ত পবিত্র হইব? এই পরামর্শ ই ভাল। বলিয়া রঘুনাথ নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করি-লেন। অল্পদিনেই তথায় যাইয়া পঁহুছিলেন এবং শ্রীজগবন্ধুর মুখপদ্ম দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—

"পিতা-জননী দুহেঁ মলে। মোতে অনাথ করি গলে॥
এণুটি রঘু অরক্ষিত। তো পাদে শরণ বাঞ্ছিত॥
তো প্রভু যাহা ইচ্ছা কর। কিনিলা দাস মুহিঁ তোর॥"

প্রভু হে! আমার পিতামাতা দুইজনেই মরিয়াছেন,—আমাকে অনাথ করিয়া গিয়াছেন। আজ রঘু 'অরক্ষিত'—রক্ষকহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাই ইচ্ছা হয় প্রভু! তোমার পাদপদ্মেই শরণ গ্রহণ করি। আমার ইচ্ছা হইলেই বা কি হইবে? তোমার ইচ্ছাই তো ইচ্ছা? এখন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। কেবল জানিয়া রাখিও, আমি তোমার ক্রীত-কিঙ্কর।

রঘুনাথ যেন দেখিতে পাইলেন, শ্রীপ্রভু পদ্মহস্ত তুলিয়া বলিতেছেন,—"রঘু! তোমার ভয় নাই ভয় নাই, তুমি এইখানেই মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া পরমানন্দে বিচরণ কর, আমি তোমায় ভৃত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম।" তিনি প্রভুর আশ্বাসবাণী শিরোধার্য্য করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কোন দিন কোন বৈষ্ণবের গৃহে, কিংবা কোন দিন কোন মঠধারীর মন্দিরে, যেদিন যেখানে জোটে মহাপ্রসাদ ভোজন, আর যখন তখন প্রভুর পদ্মমুখ দর্শন, ইহাই হইল তাঁহার একমাত্র কার্য্য। বলিতে কি, রঘুনাথের প্রাণে এখন এতই আনন্দ যে তাঁর আর পূর্ব্বের কথা কিছুই মনে পড়ে না—অন্নপূর্ণার সদা-প্রফুল্ল মুখকমলও একবার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে না।

এইরূপে কিছুদিন যায়, রঘুনাথের শ্বশুরালয়ে এই কথা প্রচার হইয়া পড়িল। একদিন গঙ্গাধর করণ স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া এ বিষয়ে এক পরামর্শসভা বসাইলেন। প্রথমেই তিনি বলিলেন,—ছিছি লজ্জার কথা লজ্জার কথা, হাড়হাবাতে জামাইটে কি না, জগন্নাথে গিয়ে ভিক্ষে মেগে বেড়াচ্ছে? অতটা বিষয়-বৈভব, হতভাগা কি না সব নষ্ট ক'রে ফেল্লে? ওঃ বাপের দেনা? বাপের দেনা তো তোর কিরে বাপু? আমি যে যৌতুকে অত ধনরত্ন দিয়েছিলাম, লক্ষ্মীছাড়া সেগুলো চুলোর দোরে দিয়ে পথের ভিখারী হোলো? হায় হায় মাথা যতদূর হেঁট হবার তা হয়েছে। আর না আর না, আর তার নামও কেহ মুখে এনো না; এখন এক কার্য্য কর, অন্নপূর্ণার আবার বিবাহের আয়োজন কর। মনে কর যে, তার বিবাহ হয়ই

নাই। আহা, হতচ্ছারা জামাইটে বাপ খেয়েছে, মা খেয়েছে, বাড়ী-ঘর-দোর, টাকা কড়ি সব খেয়েছে, তার হাতে প'ড়লে কি মা আমার আর বাঁচবে? সে তা হ'লে মাকেও আমার টপ ক'রে খেয়ে ফেল্‌বে। না, না, তার নাম আর মুখে এনো না, মুখে এনো না, অন্নপূর্ণার নূতন বরেরই আয়োজন কর। আহা, মার আমার মলিন মুখ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

যেমন গুণধর গঙ্গাধর, তাহার স্ত্রীপুত্রেরাও তেমনই। গঙ্গাধরের মতেই সকলে সম্মতি দিলেন। আশ্চর্য্য! একথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হইল না যে, ভাল রঘুনাথকে আবার কিছু টাকাকড়ি দিয়া বাড়ী ঘর দোর করাইয়া কাছেই রাখা হউক না কেন? অধার্ম্মিক কৃপণ করণ-পরিবার বিবাহিতা কন্যার বর খুঁজিতেই ব্যস্ত হইলেন। পাত্র পাইতেও বড় বিলম্ব হইল না। সেই রাজ্যের রাজমন্ত্রী; নাম বসু মহাপাত্র; তাঁহার পুত্রের সহিত অন্নপূর্ণার বিবাহ স্থির হইয়া গেল। মন্ত্রিপুত্র যার-পর-নাই দুর্ব্বৃত্ত ও অধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য। তাহার উপর অন্নপূর্ণার রূপজ মোহে সে এতই অভিভূত যে, বিবাহিতা কন্যার পাণি-গ্রহণে একটু ইতস্তত করিল না। গঙ্গাধর ও মন্ত্রিপুত্র উভয়েই ধনবান্ ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যে দেশের লোকেও কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। জ্যোতিষী আসিয়া বিবাহের দিনও স্থির করিলেন, আগামী ফাল্গুনমাসের শুক্লাপঞ্চমীর দিন শুভ লগ্নে শুভ বিবাহ হইবে।

অন্নপূর্ণা সকলই শুনিতেছেন। তিনি আর তখন নিতান্ত

বালিকা নহেন ; তাঁহার বয়স পঞ্চদশ পার হইয়া গিয়াছে। ব্যাপার বুঝিয়া তিনি নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কেবল ভাবেন, হা ভগবন্! এ আবার কি করিলে ?

"মো প্রাণনাথ থাউ থাউ। বিভা করিবে মোতে আউ ॥
মুঁ পুনি ধরি এ শরীর। বদন চাহিঁবি কাহার ? ॥"

হায় প্রভু! একি অসম্ভব কথা ; আমার প্রাণনাথ জীবিত থাকিতে-থাকিতে আমাকে আবার অন্যে আসিয়া বিবাহ করিবে ? হা ঠাকুর! এ শরীর তো আর আমার নয়, আমি যে তাঁহারই চরণে সমস্ত সমর্পণ করিয়াছি ; তবে এ শরীর ধরিয়া আবার অন্য কাহার বদন নিরীক্ষণ করিতে যাইব ? হে প্রভু! তুমি বিপন্ন গজেন্দ্রকে উদ্ধার করিয়াছিলে, হে প্রভু! তুমি সতী দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে। তুমি সর্ব্বান্তর্যামী, তোমায় আর আমি অধিক কি জানাইব, আমার বিপদ্ ত তুমি সকলই জানিতেছ। আমি সতী,—দ্বিচারিণী নহি ; আমাকেও এই আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর প্রভু! উদ্ধার কর।

অন্নপূর্ণা দিবানিশি কেবল ভগবানের কাছে এইরূপ প্রার্থনা করেন, আর বিরলে বসিয়া কাঁদেন। আহার-নিদ্রা হাস্য-পরিহাস কিছুই ভাল লাগে না। কাহারও কাছে বড়একটা যানও না। বাটীর পুরাতন পরিচারিকা,—সে-ই শৈশবে অন্নপূর্ণাকে মানুষ করিয়াছিল ; অন্নপূর্ণা কেবল তাহারই কাছে আপন দুঃখের কথা বলিয়া থাকেন। দাসীকে তিনি সদাই বলেন,—ধাই মা! এ দেশের কি কেউ নীলাচলে যায় না ? তাহ'লে তাহারই হাতে পত্র

দিয়া পতিকে বিপত্তির কথা জানাই ; আর তিনি আসিয়া আমাকে এই বিষম বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন ?

দাসীও সংবাদ রাখে। একদিন সে আসিয়া বলিল, মা অনো! ওই ওপাড়ার কয়েকজন জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছেন, পত্র দাও তো শীঘ্র দাও, আমি তাঁদের দিয়া আসি। অন্নপূর্ণাও আনন্দমনে তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখিলেন,—

"বোইলা—আহে প্রাণেশ্বর। মুঁ যেবে দাসীটি তুম্ভর ॥
আসন্তা ফাগুন মাসরে। শুকলপক্ষ পঞ্চমীরে ॥
এ রাজ্য-পাত্রকুমরকু। বিভা করিবে মোকে তাকু ॥
এথকু চাহিঁ বেগে আস। মোঠারে অচ্ছি যেবে আশ ॥
আস না-আস তুম্ভ মন। মুঁ এবে গণু অচ্ছি দিন ॥
যেবে এ কণ্ট পরিযন্তে। দেখা ন দেব তুম্ভে মোতে ॥
প্রাণ চ্ছাড়িবি আত্মাঘাতে। লাগিব স্তিরীহত্যা তোতে ॥"

ওহে প্রাণেশ্বর! আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী। আমার বিপদ্ শুন। আগামী ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে এই রাজ্যের মন্ত্রিপুত্র আমাকে আবার বিবাহ করিবে, স্থির হইয়াছে। যদি দাসীর আশা থাকে তো আর বিলম্ব করিও না, সত্বর চলিয়া আইস। অবশ্য আসা না আসা তোমারই ইচ্ছা, আমি কিন্তু দিন গণনায় নিযুক্ত রহিলাম। ঐ নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিব, যদি তাহার মধ্যে তুমি আসিয়া দেখা না দাও, তাহা হইলে আমি আত্মঘাতে প্রাণত্যাগ করিব। মনে রাখিও, এই স্ত্রীহত্যা-পাপে তোমাকেই লিপ্ত হইতে হইবে।

অন্নপূর্ণা পত্রখানি মুড়িয়া দাসীর হস্তে দিয়া বলিয়া দিলেন,

ধাই মা, আমার অনেক অনুনয়-বিনয় জানাইয়া তাঁদের বোলো যে, আমার স্বামী শ্রীক্ষেত্রে আছেন, তথায় সকলে তাঁকে 'রঘু অরক্ষিত' বলিয়াই জানে। তিনি তথায় দ্বারেদ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া জীবন ধারণ করেন। পত্রখানি তাঁহারই হস্তে দিতে হইবে। ধাই মা! তাঁদের হাতে ধ'রে আরও বোলো যে, তাঁদের অনুগ্রহেই আমি জীবন দান পাইব, আর অনন্তকোটি জীবনেও অমি তাঁদের এ ঋণ কিছুতেই পরিশোধ করিতে পারিব না, তাঁদের ঋণে আমি চির-আবদ্ধ রহিব।

দাসী পত্র লইয়া চলিয়া গেল। তাঁহাদের কাছে গিয়া বিনয়-বচনে সকল কথাই বলিল। তাঁহারাও অন্নপূর্ণার দুঃখে দুঃখী; আগ্রহ করিয়াই পত্রখানি লইয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কতকদিন পরে মাঘমাসের শেষা-শেষি তাঁহারা শ্রীধামে আসিয়া শ্রীপ্রভুর চন্দ্রমুখ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহারা একটি বাসা ভাড়া করিয়া কিছু দিন তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভিখারী দেখিলেই তত্ত্ব করেন যে, এই সেই রঘু অরক্ষিত কি না? কিছুদিন যায়, হঠাৎ একদিন সিংহদ্বারের সম্মুখে তাঁহাদের সহিত রঘু অরক্ষিতের দেখা হইল। নাম-ধাম প্রভৃতির পরিচয় লইয়া তাঁহারা বুঝিলেন যে, হাঁ এই ব্যক্তিই অন্নপূর্ণার স্বামী রঘুনাথ বটে। তাঁহারা তাঁহাকে বাসায় সঙ্গে করিয়া আনিলেন, আদর পূর্ব্বক মহাপ্রসাদ ভোজন করাইলেন এবং অন্নপূর্ণার পত্রখানি তাঁহার হস্তে দান করিলেন। রঘুও পত্রখানি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া অতিমাত্র চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হাত গণিয়া

হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, ফাল্গুন-শুক্লাপঞ্চমীর মাত্র দশটি দিন বাকী আছে। মাসেকের পথ, ইহার মধ্যে যাওয়া যায় কি প্রকারে? না গেলেও ত বিষম বিপদ্; সতী নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। অহো কি কষ্ট, দুরন্ত স্ত্রীহত্যা-পাতকে আমায় অনন্তকাল নরকযাতনা ভোগ করিতে হইবে? হা জগন্নাথ! ভবের কাণ্ডারী তুমি ভিন্ন এ দুস্তর চিন্তার সাগরে কে আমায় পার করিয়া দিবে?

এইরূপ চিন্তার তাড়নায় কাতর হইয়া রঘুনাথ তাঁহার চিন্তামণি জগন্নাথের সম্মুখে গমন করিলেন। তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কপালে যুগল কর রাখিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"বোইলা—নমো চক্রপাণি। চিন্তার্থিজন-চিন্তামণি॥
নমস্তে বাঞ্ছাকল্পতরু। কৃপাসমুদ্র মহামেরু॥
ভৃত্যকামনা-কামধেনু। ঘোর-বিপত্তি-তম-ভানু॥
মোর সঙ্কট নিবারণ। তুম্ভহুঁ—নাহিঁ অন্য জন॥"

সর্ব্বান্তর্যামিন্! তুমি তো সকলই জানিতেছ;—তোমা বই আর আমার কে আছে? এখন তুমি আমার সহায় স্বপক্ষ না হইলে কে আমায় রক্ষা করিবে বল?

এইরূপ কত কথা বলিয়া-কহিয়া রঘুনাথ তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং সিংহদ্বারের পার্শ্বে একস্থানে ছেঁড়া চট বিছাইয়া শয়ন করিলেন। তিনি মনেমনে শরণাগতবৎসল ভগবানের ভাবনা করিতে-করিতেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। জগন্নাথ তাহা জানিলেন, সেবকের ব্যথায় বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন

এবং অধিক রাত্রে বেতালকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—বেতাল! যাও, শীঘ্র যাও; সিংহদ্বারে আমার পরম ভক্ত রঘুনাথ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে শীঘ্র কলাবতীপুরে গঙ্গাধর করণের দ্বারে রাখিয়া এস। খুব সাবধানে লইয়া যাইও, দেখো যেন তাহার নিদ্রা ভঙ্গ না হয়, কেহ বহিয়া লইয়া যাইতেছে, এ কথা যেন সে জানিতেও না পারে। যাও, শীঘ্র যাও, আর বিলম্ব করিও না।

বেতাল 'তথাস্তু' বলিয়া, তখনি তথা হইতে চলিয়া গেল এবং রঘুনাথকে মায়াপালঙ্কে শয়ন করাইয়া শূন্যপথে হু-হু করিয়া লইয়া চলিল। চক্ষের নিমেষ না পড়িতেপড়িতে বেতাল তাঁহাকে কলাবতী-পুরে শ্বশুরবাটীর দ্বারে শোয়াইয়া রাখিয়া জগবন্ধুর সমীপে ফিরিয়া আসিল এবং সকল কথা বলিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

এদিকে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই রঘুনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখেন,—এ আবার কোথায় আসিলাম? কই সিংহদ্বারতো দেখিতেছি না? নীলাচলের অন্য কোন স্থান বলিয়াও তো বোধ হইতেছে না, এযে অন্য কোন দেশে আসিয়াছি দেখিতেছি? এ দেশের নাম কি? এই সম্মুখের বাড়ীই বা কাহার? সেখান থেকে এখানে আমায় আনিলই বা কে? এতো বড় বিপরীত ব্যাপারই দেখিতেছি; কাহাকেই বা এসব কথা জিজ্ঞাসা করি?

রঘুনাথ মনেমনে এইরূপ নানা তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। বিবাহের পরে আর বড়একটা আসা হয় নাই বলিয়া তিনি চিনিতেও পারিলেন না যে,—ইহাই আমার শ্বশুরবাড়ী। একটু বেলা হইলে পথে লোকজনের চলাচলি আরম্ভ হইল। রঘুনাথ একে ওকে

জিজ্ঞাসা করেন,—হাঁগা এদেশের নাম কি?—সম্মুখে এ প্রকাণ্ড অট্টালিকাই বা কাহার? সকলেই বলিল—এ কলাবতীপুর; আর এই বাড়ী গঙ্গাধর করণের। শুনিয়াই রঘুনাথ ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন হইতে দরদর অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কেবলই ভাবেন,—এ খেলা তোমারই প্রভু, তোমারই খেলা। আহা আমার দারুণ বেদনা তোমার করুণ হৃদয়ে যাইয়া আঘাত করিয়াছে, তাই তুমি আমায় মায়া করিয়া এথায় পাঠাইয়া দিয়াছ। আহা ঠাকুর! এই খেলা অন্তের পক্ষে অসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু তোমার আবার এ একটা কার্য্যই বা কি?

"ব্রহ্মাণ্ড যার খেলঘর। এ কথা কেতেক মাতর?"

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিরাট-বিগ্রহ তোমার খেলার ঘর বই তো নয়; ইহাতে তুমি যেখানে-সেখানে খেলার পুতুল আমাদের লইয়া যে খেলা ইচ্ছা সেই খেলাই খেলিতে পার, তাহাতে আর কথাটা কি আছে?

রঘুনাথ আপনহারা হইয়া প্রভুর উদ্দেশে প্রাণেপ্রাণে এইরূপ কত কি বলিতেছেন, এমন সময় তাঁহার দুই-চারিজন শ্যালক বাটীর বাহিরে আসিলেন এবং দূর হইতেই রঘুনাথকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। অমনি তাঁহারা তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মাতাপিতা ও অন্যান্য ভ্রাতাকে রঘু অরক্ষিতের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। সকলেই শশব্যস্তে বাটীর বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, হাঁ, ছেঁড়া নেকড়াপরা সেই তো বটে। দেখিয়া অন্নপূর্ণার বড় আনন্দ হইল। তিনি মনেমনে ভগবান্‌কে শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন,

কিন্তু আর আর সকলের মুখ শুকাইয়া গেল, তাঁহারা ভাবেন—এ আপদ্ আবার কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। যাহাই হউক, লোক-লজ্জার খাতিরে সকলে রঘুনাথকে বাটীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং ভৃত্যদ্বারা তৈলমর্দ্দন করাইয়া স্নান-মার্জ্জন করাইলেন। দিব্য বসনভূষণে ভূষিত করাও হইয়া গেল। সত্বর ভোজনের আয়োজন হইল। রঘুনাথ জগন্নাথকে অন্ন নিবেদন করিয়া ভোজনে বসিলেন। শ্যালকগণের কৃত্রিম হাস্যপরিহাসের সহিতই আহার শেষ হইয়া গেল। শ্বশুর শাশুড়ী ও শ্যালকগণ হৃদয়ে হলাহল রাখিয়া রঘুর চারিদিক্ ঘেরিয়া বসিয়া মুখে মিষ্টকথার অমৃতবর্ষণ করিতে লাগিলেন। জামাই-আদরের যেন আর সীমা পরিসীমা নাই। কিছুক্ষণ পরে 'একটু বিশ্রাম কর' বলিয়া সকলে চলিয়া গেলেন।

রঘুনাথ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন। ব্রীড়াবনতা পতিব্রতা অন্নপূর্ণা ধীরে-ধীরে আসিয়া পতির পদতলে বসিলেন এবং কোমল-করে মৃদুমৃদু পাদসংবাহন করিতে লাগিলেন। কত কথাই সতীর মনে আসিল, কত কথাই বলিব-বলিব মনে হইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বাহির হইল না, মনেই সকল কথা লয় পাইয়া গেল। রঘুনাথের দশাও ঠিক তাহাই হইল; তিনিও তাঁহাকে একটি কথাও কহিতে পারিলেন না। তবে কি দুজনে কোন কথাই হইল না? হইল বই কি। কথা হইল, ছলছল নেত্রের কলকল ভাষায়। দুইজনেরই পলকহীন নয়ন দিয়া প্রেমের জল গড়াইয়া পড়িল;—দুইজনেরই তাপিত প্রাণ শীতল হইয়া গেল।

এদিকে নীরবতার সুরবাহারে অশ্রুরেখার কোমল তারে

দম্পতীর মিলনগীতির আলাপ হইতে থাকিল, ওদিকে পিশাচপ্রকৃতি করণপরিবার নয়টি জিহ্বাযন্ত্র একসুরে বাঁধিয়া দম্পতীর চিরবিচ্ছেদের বজ্ররাগিণীর আলাপ জুড়িয়া দিলেন। এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া গঙ্গাধর, তাঁহার স্ত্রী ও সপ্ত পুত্র পরামর্শ আঁটিলেন, আজই রাত্রে বিষপ্রয়োগে রঘুনাথের প্রাণসংহার করিতে হইবে। অন্নপূর্ণার জন্ত তো কিছু ভাবনা নাই, রঘুনাথ মরিলে সে তো আর অনাথা হইতেছে না? মন্ত্রিপুত্রের সহিত বিবাহ হইলেই তাহার সুখসম্পদ্ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হইবে।

যেমন পরামর্শ অমনি কাজ। গোপনে-গোপনে বিষ সংগ্রহ করা হইল। বন্দোবস্ত হইল,—খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশাইতে হইবে। সন্ধ্যা হইল। আহার্য্য প্রস্তুতেরও আয়োজন হইতে লাগিল। পাপাশয়া গঙ্গাধর-জায়াই বিষ মিশাইয়া-মিশাইয়া অন্নব্যঞ্জন পিষ্টক-পায়সাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। মাতাপিতা ও ভ্রাতার গুপ্ত পরামর্শ ও চুপিচুপি কথাবার্ত্তায় চতুরা অন্নপূর্ণার মনে কেমন সন্দেহ জন্মিল। তিনি রন্ধনকার্য্যে জননীর সাহায্য করিবার অছিলায় রন্ধনশালায় আসিলেন। মাতা অমনি বলিয়া উঠিলেন,—না মা, আজ আর তোমার কাজকর্ম্ম কিছুই করিবার দরকার নাই, কতদিনের পর জামাই এসেছেন, যাও মা তাঁহারই সেবা করগে। মাতার বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও অন্নপূর্ণা "একটু থাকি একটু থাকি" বলিয়া তথা হইতে নড়িলেন না। ব্যাপার বুঝিতে তাঁহার বড় বিলম্বও হইল না। বুদ্ধিমতী আঁচে-ওঁচেই সকল ব্যাপার বুঝিয়া ফেলিলেন। দুরন্ত চিন্তায় তাঁহার হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিতে লাগিল।

ভাবিলেন; যাই, পতির কাছে সকল কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিই। তথা হইতে যাইবার জন্য তাঁহাকে আর কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইল না। মাতার ঘনঘন অনুরোধেই তাঁহাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল। গৃহে আসিয়া দেখেন, পতি বাহিরবাটীতে গিয়াছেন। অন্নপূর্ণার বড় চিন্তা হইল, এখন করা যায় কি, কি উপায়ে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিই? কি প্রকারেই বা তাঁহার জীবন রক্ষা করি?

অনেকক্ষণ চিন্তার পর অন্নপূর্ণা স্থির করিলেন, এক কার্য্য করা যাউক, একখানি পত্র লিখি, কোন সুযোগে সেখানি পিষ্টকের মধ্যে রাখিয়া দিই। শ্বশুরবাড়ী থাকিবার সময় দেখিয়াছি, তিনি পিষ্টক বড় ভালবাসেন। অগ্রে পিষ্টক খাইতে গেলেই পত্রখানি তাঁহার নজরে পড়িবে, আর অমনি তিনি সাবধান হইয়া যাইবেন; বিষ-মিশ্রিত অন্ন আর ভোজনই করিবেন না। অন্নপূর্ণা তাহাই করি-লেন, শ্রীহরি স্মরণ করিয়া এক টুক্‌রা তালপত্রে মাত্র দুইটী ছত্র লিখিলেন,—

"বিষ যে ভরিচ্ছন্তি এথে। ভুঞ্জিব নাহিঁ কদাচিতে॥"

তার পর তিনি তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় গিয়া দেখেন যে, রন্ধনের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, সুবর্ণপাত্রে সকল খাদ্য সাজানো হইতেছে। সাজানোও শেষ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণার মাতা বলি-লেন,—"মা অনো! একটু দাঁড়াও তো মা, ঘরের ভিতর আহারের স্থান হইয়াছে, আমি সেখানে কতক কতক রাখিয়া আসি।" অন্ন-পূর্ণাও তাই চায়। মা-ও কতক খাবার লইয়া চলিয়া গেলেন, অন্ন-

পূর্ণাও ক্ষিপ্রহস্তে পিষ্টকপাত্রের উপরিস্থিত পিষ্টকের মধ্যে তালপত্র-টুকু পূরিয়া দিলেন।

অন্নপূর্ণার মাতা খাবার-দাবার পরিবেষণ করিয়া পরিচারিকার দ্বারা রঘুনাথকে অন্দরে ডাকাইলেন এবং আহারের জন্য অনুরোধ করিলেন। পাপীয়সীর ভিতরটা জামাতার মৃত্যুকামনায় পূর্ণ থাকিলেও মুখে যেন আদর আর ধরে না। রঘুনাথ এত ব্যাপার কিছুই জানেন না, তিনি পাদপ্রক্ষালন করিয়া আসনে বসিলেন এবং আনন্দমনে অন্নব্যঞ্জনাদি সমস্তই জগন্নাথকে নিবেদন করিয়া দিলেন। আচমনের জলও হস্তে গ্রহণ করিলেন। অন্নপূর্ণা দূর হইতে তাহা দেখিতেছেন, আর তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে। তিনি একবার ভাবেন—হায় যদি তিনি অগ্রে পিষ্টকটি না-ই গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কি হইবে? আবার ভাবেন, যা থাকে কপালে, ধাইয়া গিয়া পতিকে বলিয়া আসি, ওগো, ওসব কিছু খেওনা গো খেওনা,—সকল খাবার বিষে ভরা গো বিষে ভরা।

ভগবানেরই খেলা, অন্নপূর্ণাকে আর অধিক ভাবিতে হইল না, রঘুনাথ আচমন করিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই পিষ্টকটিই হস্তে ধারণ করিলেন। পিষ্টকটি ভাঙ্গিবামাত্র তাহার ভিতর হইতে তালপত্রের টুকরাটি পড়িয়া গেল। ছোট একটু তালপাতা বই তো নয়, অন্যে তাহা বড় একটা দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন কেবল রঘুনাথ এবং অন্নপূর্ণা। রঘুনাথ লেখাটুকু পড়িয়া সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। এদিকে ভোজন আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া অন্নপূর্ণার জননী কৌশল করিয়া কন্যাকে তথা হইতে সরাইয়া দিলেন। বলিলেন,—

মা অনো! তুমি ততক্ষণ ধাইমার কাছে গিয়া গল্প করগে, আমি ডাকিয়া আনিব এখন। যাও মা! যাও। মনের ভাব,—'ও এখানে থাকিলে হয় তো কোন গোলযোগ বাধিতে পারে, আর গল্প করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে তো সকল লেঠাই চুকিয়া গেল।' অন্নপূর্ণাও যাইতে কোন আপত্তি করিলেন না, কেন না, তাঁহার বিশ্বাস, স্বামী যখন পত্র পাইয়াছেন, তখন আর ঐ বিষমাখানো খাবার কিছুতেই আহার করিতেছেন না, তাঁহার জীবনের জন্য আর ভাবনা নাই।

রঘুনাথ কিন্তু বিষম সমস্যাতেই পড়িয়া গেলেন। তাঁহার হাতের পিঠা হাতেই রহিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—হায়, আমি করিলাম কি? আমার প্রভুকে আমি বিষ ভোজন করাইলাম? হা প্রভু! আমার এ অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর নাথ, ক্ষমা কর। এখন বুদ্ধি দাও ঠাকুর! আমি কি করি?

"বুদ্ধি যে ন দিশই মোতে। প্রসাদ চ্ছাড়িবি কেমন্তে॥
জনম হোইলে নিয়ত। অবশ্য মরিবার সত॥
যেবে প্রসাদ চ্ছাড়ি দেবি। কালে কি অমর হোইবি?॥
কেবল প্রভু-অপরাধে। পড়িবি মহা নর্ক মধ্যে॥"

হা নাথ! কোন বুদ্ধিই যে আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না? আমি তোমার প্রসাদই বা ছাড়ি কি প্রকারে? যখন জন্ম লাভ করিতে হইয়াছে, তখন অবশ্যই একদিন মরিতেও হইবে, আর এই প্রসাদ পরিত্যাগ করিলেই কি অমর হইয়া যাইব, তাওতো নয়। বরং লাভের মধ্যে ইহাই হইবে যে, প্রভু! তোমার কাছে মহা অপরাধেই পতিত হইতে হইবে এবং সেই অপরাধে দুরন্ত নরক মধ্যে

খাইয়া পড়িব। ইহাতে আমার লাভই বা কি হইবে? না না, প্রসাদ আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তা প্রাণ থাকুক আর যাউক।

রঘুনাথ পিষ্টকহস্তে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। শ্বাশুড়ী রাক্ষসী মনে করিতে লাগিলেন, জামাতা বড় ভগবদ্ভক্ত, তাই বুঝি ভোজনের পূর্ব্বে ভগবানকেই ভাবিতেছেন? রঘুনাথ জানিয়া-শুনিয়াও অবিচলিতচিত্তে সেই বিষমিশ্রিত অন্ন গোবিন্দ স্মরণ করিতে-করিতে ভোজন করিলেন, রেণুপ্রমাণও অবশিষ্ট রাখিলেন না। দেখিতে-দেখিতে বিষ তাঁহার সর্ব্ব শরীর ঘিরিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া চড়িল। আর রক্ষা নাই, রঘুনাথ অমনি অচেতন হইয়া ধরায় ঢলিয়া পড়িলেন এবং যাতনায় ছটফট করিতে-করিতে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। দেখিয়া গঙ্গাধররমণী আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন, তাড়াতাড়ি স্বামী ও পুত্রকে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহাদের আনন্দই বা দেখে কে? সকলে মিলিয়া পরামর্শ আঁটিলেন, রাত্রি প্রভাত হইলেই ইহাকে মাটীর ভিতর পুঁতিয়া ফেলিব এখন। কেহ জিজ্ঞাসা করে তো বলা যাইবে, কল্য রাত্রে সর্পাঘাতে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। এই বলিয়া সেই ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া সকলে চলিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা মায়ের কথায় চলিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরে শান্তি নাই; প্রাণ যেন সদাই হারাই হারাই করিতেছে। পতির কোলে বিষমিশ্রিত অন্ন দেখিয়া কোন্ পতিব্রতার প্রাণ শান্ত থাকিতে পারে বল? তিনি কেবল কাতরভাবে শয়নগৃহের এদিক্

ওদিক্ করিতেছিলেন। মাতা পিতা ও ভ্রাতার ফিস্ফাস্ কথা বলা এবং পা টিপে-টিপে চলা-বুলার ধরণ দেখে তাঁহার প্রাণে সন্দেহ আরও জাগিয়া উঠিল, সকলে চলিয়া গেলে তিনি শয়ন-গৃহের বাহিরে আসিলেন। আস্তেআস্তে ভোজন-গৃহের দ্বারে গমন করিলেন। গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে দ্বারের ফাঁক দিয়া দেখিলেন, তাঁহার জীবনধন ভোজনের আসনের উপর জীবনহারা হইয়া পড়িয়া আছেন। দেখিয়া সতীর শরীর থরথর কাঁপিতে লাগিল, তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেইখানেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে চাহিয়া দেখেন, তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকারের মত চারিদিকেই সূচীভেদ্য অন্ধকার। দ্বারের অবকাশ দিয়া আবার দেখিতে গেলেন, দেখিলেন গৃহের দীপও নিবিয়া গিয়াছে, সেখানেও জমাটবাঁধা অন্ধকার। অন্তরে ঘরে-বাহিরে সর্ব্বত্রই অন্ধকারের রাজত্ব। এ অবস্থায় সতী কি করেন; তিনি তাঁহার প্রাণের হরিকেই প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ভেরীর নিনাদ এক যোজন মাত্র যায়, বজ্রের ধ্বনি দ্বাদশ যোজন মাত্র গমন করিতে পারে, কিন্তু ভক্তের অন্তরের শব্দ মুহূর্ত্তমধ্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ফেলে। হরিপরায়ণা অন্নপূর্ণার অন্তরের কথা দেখিতে-দেখিতে বিশ্বব্যোম ভেদ করিয়া ভগবদ্ধামে চলিয়া গেল। প্রভুর রত্নসিংহাসন অমনি থরথর কাঁপিয়া উঠিল। ভক্তের হৃদয়ের ব্যথা ব্যথাহারী হরির হৃদয়ে যাইয়া দারুণ আঘাত করিল; ভক্ত রঘুনাথের বিষম বিপত্তি বুঝিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বিদ্যুদ্-গতিতে কুলাবতীপুরে গমন করিলেন। অকস্মাৎ ঘরের ভিতর হইতে

যেন কিসের শব্দ অন্নপূর্ণার কাণে আসিয়া বাজিল। ব্যস্তসমস্তভাবে তিনি দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখেন, দ্বারের ফাঁক দিয়া স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোক বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাড়াতাড়ি সেই ফাঁক দিয়া দেখেন যে, ঘরের কালো আঁধার ভেদ করিয়া কালো মাণিক জ্বলিয়া উঠিয়াছে! আহা তাঁহার প্রাণের হরি তাঁহার প্রাণের পতিকে কোলে লইয়া স্নেহময় জনকজননীর মত সর্ব্বাঙ্গে পদ্মহস্ত বুলাইতেছেন, আর বলিতেছেন,—

"বোইলে—উঠ রে নন্দন। কিপাঁ তু নিদে অচেতন॥
যাহা সহায় পীতবাস। তার গরল ছ্যার কিস?"

ওরে আমার নয়নানন্দ রঘুনাথ! উঠে বোস্ বাছা উঠে বোস্। তুই নিদ্রায় অচেতন রহিয়াছিস্ কেন? এই দেখ্ বাছা আমি এসেছি। আমি যাহার সহায়, তুচ্ছ বিষ তাহার কি করিতে পারে? উঠে বোস্ বাছা উঠে বোস্।

জগজ্জীবনের সঞ্জীবন মন্ত্রে মৃত রঘুনাথ পুনর্জীবন পাইলেন। ঘুমন্ত রঘুনাথ যেন জাগরিত হইলেন। সঙ্গেসঙ্গে সেই আলোকও অদৃশ্য হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা অন্ধকারে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার চিরতরে দূর হইয়া গেল। আলোকভরা আনন্দপোরা হৃদয় লইয়াই তিনি শয়নগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

খুব গাঢ় নিদ্রার পর জাগরিত হইলে যেমন মনে হয়,—বড় সুখেই ঘুমাইয়াছি, কিছুই জানিতে পারি নাই; রঘুনাথের অবস্থাটাও এখন ঠিক তেমনই। তাঁহারও মনে হইতে লাগিল—বাঃ, খাসা

ঘুমাইতেছিলাম, কে আমার আনন্দনিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিলরে? তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখেন, কোথাও কেহ নাই, কেবল ঘুটঘুটে আঁধারে ঘরদ্বার ভরিয়া রহিয়াছে। ক্ষণ পরেই তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল; ভাবিলেন,—তাইতো আমি সেই রঘুনাথ না? বিষভোজনে আমি না মরণাপন্ন হইয়াছিলাম? হাঁ হাঁ তাইতো বটে, তাইতো বটে। ওঃ কি অসহ্য যাতনা, কি বিষম দাহ জ্বালা। মনে হইলে এখনও মূর্চ্ছিত হইতে হয়। হায়, সে জ্বালা আমার কে জুড়াইয়া দিল?—কে আমার প্রাণহীন শরীরে প্রাণের সঞ্চার করিয়া দিল? প্রাণনাথ! তুমি?—তুমিই কি? তুমি না হইলে ভৃত্যের প্রতি এত করুণা কাহার হইবে করুণাময়? হা প্রভু! তোমার খেলা তুমিই ভাল বুঝ; কোল হইতে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিতেও তুমি, আবার আদর করিয়া বুকে লইয়া মুখ চুমিতেও তুমি। তোমার এ লীলারহস্য অজ্ঞ মানব আমরা কি বুঝিব প্রভু! বুঝিবারই বা দরকার? দাও দাও নাথ!—ব্যথা দাও ব্যথা দাও, নিত্য নূতন নূতন ব্যথা দাও ব্যথা দাও, আমি মাথা পাতিয়াই লইব। প্রতি ব্যথার পশ্চাতে পশ্চাতে তোমার মমতা-মাখানো ব্যথা-জুড়ানো মূর্ত্তি তো দেখিতে পাইব! তাহা হইলেই হইল। তাহাই আমার পরম লাভ,—পরম শান্তি। দাও দাও নাথ! ব্যথা দাও ব্যথা দাও।

ভক্ত রঘুনাথ তাঁহার ব্যথাহারী হরির উদ্দেশে এইরূপ কত কথাই বলিলেন,—কত হাসিলেন-কাঁদিলেন, তার পর গদ্গদ স্বরে 'রাম কৃষ্ণ হরি' প্রভৃতি নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নামের

নেশায় রঘুনাথের বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল। দেখিতে-দেখিতে রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল। পাপপ্রকৃতি করণপরিবারের আর নিদ্রা নাই। সারা রাত্রি বিছানায় পড়িয়া সকলেই এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন। রঘুনাথের বিষজ্বালার অপেক্ষা ইঁহাদের হৃদয়ের জ্বালা বোধ হয় আরও বেশী। যাহাকে যাতনা দেওয়া যায়, তাহার অপেক্ষা, যাহারা যাতনা দিবার মতলব আঁটে, তাহাদের যাতনা যে অনেকগুণে অধিক। রঘুনাথ বিষে অচেতন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার জ্বালা আর তিনি জানিতেও পারিলেন না, কিন্তু গঙ্গাধর করণ, তাঁহার পত্নী ও পুত্রাদি কাল্পনিক চিন্তার জ্বালায় অধীর হইয়া পড়িলেন। ঐ কে বুঝি আমাদের আচরণ জানিয়া ফেলিল, ঐ কে বুঝি রাজদরবারে যাইয়া আমাদের কথা বলিয়া দিল, ঐ বুঝি আমাদের ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য সেপাই-সান্ত্রী প্রেরিত হইল; ইত্যাদি কত চিন্তাই তাঁহাদের হৃদয় জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। তাঁহারা একবার উঠেন একবার বসেন, এক-একবার জানালা দিয়া রাত্রি পোহাইল কিনা উঁকি মারিয়া দেখেন; কিন্তু রাত্রি আর প্রভাত হয় না;—সে যেন বাড়িয়া-বাড়িয়াই চলিয়াছে। এইবার অরুণ-আলোক দেখিয়া সকলেই তাঁহারা শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং একত্রিত হইয়া শব লইয়া যাওয়া কিংবা মাটির মধ্যে পুঁতিয়া ফেলা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া ভোজনগৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নরাধম গঙ্গাধরই তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে, সূর্য্যালোকে গৃহ-মধ্য উদ্ভাসিত হইয়াছে; সেই সুস্পষ্ট আলোকে তাঁহারা যাহা দেখি-

লেন, তাহাতে সহজে বিশ্বাসস্থাপন করা যায় না। তাঁহারা দেখিলেন,—রঘুনাথ ভোজনের আসনের উপর স্থির ধীরভাবে বসিয়া আছেন, তাঁহার সকল শরীর পুলকে পূর্ণ, বদনে দিব্য-জ্যোতি, নিশ্চলনয়নে জলধারা, ওষ্ঠাধর প্রকম্পিত, বিলম্বে বিলম্বে রসনায় অস্ফুট রাম কৃষ্ণ হরি নাম উচ্চারিত। তিনি যেন এখানে থাকিয়াও এখানে নাই,—এ লোক ছাড়িয়া আর কোন্ লোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেলেন। ভাবেন—এ আবার কি বিচিত্র ব্যাপার! কাহারও মুখে কথাটি নাই। সকলে গৃহের ভিতর গমন করিলেন। তখনও রঘুনাথ অচল অটল। তাঁহাদের পদশব্দে ভাববিভোর রঘুনাথ যেন আর কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। অমনি তিনি দুই বাহু প্রসারিয়া—'এস এস প্রভু!' বলিয়া আলু-থালু-ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন, কই কোথায় প্রভু; হরিহরি এ যে তাঁহারই হন্তারক শ্বশুর শ্বাশুড়ী ও শ্যালকগণ!

মাতালের মত টলিতে-টলিতে রঘুনাথ আবার সেই আসনেই বসিয়া পড়িলেন। তখন গঙ্গাধর প্রভৃতির মাথায় টনক নড়িল। তাঁহারা ভাবিলেন,—এ তো বড় ছোটখাট লোক নয় দেখিতেছি। এত বিষ খাইয়াও কি মানুষ বাঁচে? এ বুঝি কোন দেবতাই হইবে? ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাঁহারা রঘুনাথের শরণাগত হইলেন এবং বিনয়বাক্যে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথও হাস্য-প্রফুল্ল বদনে বলিলেন,—

"তুম্ভর কিছি নাহিঁ দোষ। পূর্ব্বে কাহাকু দেলি বিষ।

তেই এ জন্মে কলি পান। অর্জ্জিলা কথা নোহে আন ॥”

ইহাতে আপনাদের কিছুই দোষ নাই দোষ নাই; আমি বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে কাহাকেও বিষ দান করিয়াছিলাম, তাই এ জন্মে আমাকে সেই বিষ পান করিতে হইল। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল তো অন্যথা হইবার নয়; অবশ্যই তাহা ভোগ করিতে হইবে। তবে বিষ ভোজনেও যে আমি প্রাণ পাইলাম, সে কেবল আমার প্রাণপতি দারুব্রহ্মমূর্ত্তি ছিলেন বলিয়া। এখন আপনাদের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে;—আপনারা আমার দারিদ্র্য দেখিয়া আপনাদের কন্যা অন্যের করে অর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন; ভাল তাহাই হউক, আমায় দয়া করুন, আমি আসি; কিন্তু আর একটা কথাও বলি, যদি আপনাদের ধর্ম্মের ভয় থাকে, তবে আমার পত্নী আমাকেই দান করুন, সে আমার দুঃখীর সঙ্গিনী, তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যাই। দেওয়া না-দেওয়া অবশ্য আপনাদেরই ইচ্ছা, ইহাতে আমার কোন জিদ-জবরদস্তি নাই।

এই কথা বলিয়া রঘুনাথ উচ্চস্বরে মুকুন্দ মাধব মুরারি প্রভৃতি ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে-করিতে গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন। দেখিতে-দেখিতে রঘুনাথ একবারে রাস্তায় হাজির। সপ্ত পুত্রসহ গঙ্গাধরও পাছুপাছু ধাইয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। বলিলেন, আজিকার দিনটা এখানে থাক, কল্য তোমার পত্নীকে তুমি সমভি-ব্যাহারে লইয়া যাইও, কোন আপত্তিই করিব না। রঘুনাথ কিন্তু আর সেই পাপ-পুরীতে কিছুতেই প্রবেশ করিলেন না, এক বৃক্ষমূলে যাইয়া বসিয়া রহিলেন।

গঙ্গাধর করেন কি, 'আচ্ছা আমি এখনই আসিতেছি' বলিয়া পুত্রসহ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। এদিকে অন্নপূর্ণা পিঞ্জর-রুদ্ধা পক্ষিণীর ন্যায় গৃহমধ্যে ছটফট করিতেছিলেন; প্রভাতের ব্যাপার তিনি কিছুই জানেন না। হতভাগ্য পিতা ও ভ্রাতারা রাত্রি প্রভাত হইতে-না-হইতে তাঁহার শয়নগৃহের দ্বার চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। গঙ্গাধর গৃহিণী ও পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া অন্নপূর্ণার শয়নগৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন এবং গৃহমধ্যে গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল্ অন্নপূর্ণা! বল্, তুই তোর কাঙ্গাল স্বামীর সঙ্গে যাইতে চাহিস্; না আমাদের কাছে থাকিতে ইচ্ছা করিস্?

অন্নপূর্ণা লজ্জাজড়িত কণ্ঠে কিন্তু দৃঢ়তার সহিতই বলিয়া উঠিলেন,—পিতা! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি আমার পতির সহিতই গমন করিব। কাঙাল হউন, ভিখারী হউন, যাহাই হউন, আমি তাঁহারই গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছি, তিনিই আমার একমাত্র গতি। পতির কথা বলিতে-বলিতে পতিব্রতার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। অন্নপূর্ণা সিংহিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নে দপদপ অনল জ্বলিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা যেন আর সে অন্নপূর্ণা নাই, দানব-দলনীর মত তিনি সেই দুষ্ট দানব-দলকে নেত্রানলে ভস্ম করিতে উদ্যত হইলেন। কঠোর কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—পিতা পিতা! তোমরা আমায় দ্বিচারিণী করিতে চাও?—পতিকে বঞ্চিত করিয়া পরপুরুষের করে অর্পণ করিতে চাও? পারিবে না, পারিবে না; আমি তেমন মেয়ে নই,—আমি সতী; প্রাণ থাকিতে

আমায় তাহা পারিবে না পারিবে না। নিশ্চয় জানিও, তাহা হইলে আমি আত্মঘাতিনী হইব। সতীর অভিশাপে তোমার সাধের সংসার ছারেখারে যাইবে।

জলের উত্তাপ কতক্ষণ থাকে? শৈত্যগুণই যে তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সরলা অন্নপূর্ণার কোপও অধিকক্ষণ রহিল না। তিনি আবার পিতার চরণ ধারণ করিয়া কাতর-কোমল-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—ক্ষমা করুন পিতা! ক্ষমা করুন। আমার পতির সহিত আমাকে যাইতে দিন।

"মুঁ যোগী সে মোহর থাল। মোতে রখিলে অমঙ্গল॥"

দেখুন, আমি যেন যোগী, আর পতি হইতেছেন আমার ভিক্ষাপাত্র, তিনিই আমার একমাত্র সম্বল। আমাকে এখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে আপনার মঙ্গল নাই জানিবেন। তাই মিনতি করিয়া বলি, আমাকে আমার পতির সহিত যাইতেই অনুমতি দান করুন।

গঙ্গাধর তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণ একে রঘুনাথের প্রভাব দর্শনে ভীত-ভীত ছিলেন, তাহার উপর অন্নপূর্ণার অবস্থা দেখিয়া আরও অধিক ভীতচিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অনেক পরামর্শের পর সকলেই স্থির করিলেন যে, রঘুনাথের সহিতই অন্নপূর্ণাকে যাইতে দেওয়া হউক। তখনই অন্নপূর্ণাকে সাজানোগোজানো হইল। গঙ্গাধর স্বয়ং ধনরত্নসহ কন্যার করে ধরিয়া রঘুনাথের সমীপে লইয়া গেলেন এবং বিনয়বচনে বলিলেন,—নাও বাবা! তোমার পত্নী তুমি গ্রহণ কর। আর আমাদের প্রতি দয়া করিয়া

যাও, যেন কোন অমঙ্গল না হয়। তবে একটা বড় দুঃখ রহিল, বাপ-মা থাকিতে-থাকিতে বাছার আমার সংসার-লজ্জা কিছুই রাখিলে না।

বলিতে-বলিতে বাষ্পবেগে গঙ্গাধরের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতে-করিতে রঘুনাথের করেকরে অন্নপূর্ণাকে সমর্পণ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—বাবা! এই নাও তোমার পত্নী নাও, আমার অন্নপূর্ণা আজ হইতে তোমার হইল—আজ হইতে ইহার সকল ভার তোমার উপর পড়িল। বলিয়া তিনি কাঁদিতে-কাঁদিতে চলিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণাও পতির চরণতলে পতিত হইয়া একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। উঠিয়া কপালে হাত দুইটী রাখিয়া বলিলেন,—প্রাণনাথ! এখানে আর একটুও বিলম্ব করিবেন না, কোথায় যাই-বার ইচ্ছা চলুন, দাসী আপনার অনুগমন করিতে প্রস্তুত। রঘুনাথও প্রীতিভরে পত্নীর হস্তধারণ করিয়া 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা দুইজনে চলিলেন। গঙ্গাধর-প্রেরিত কয়েকজন দাস-দাসীও তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিল। রঘুনাথের বারংবার নিষেধে অনেকেই ফিরিয়া গেল বটে; ফিরিল না কেবল অন্নপূর্ণার সেই ধাই-মা, আর যাহারা আশৈশব অন্নপূর্ণাকে বড় ভালবাসে, এইরূপ দুই-চারিজন দাসদাসী। তাহাদের সহিত কড়ার হইল যে, তাহারা বরাবর সঙ্গে যাইতে পাইবে না, গ্রামের সীমা পার করিয়া দিয়াই ফিরিয়া আসিবে।

গঙ্গাধর বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। অন্নপূর্ণাকে বিদায় দিয়া তাঁহার প্রাণে আজ একটুও শান্তি নাই। তিনি বিষণ্ণ-মনে অন্তঃপুরে পত্নীসমীপে গমন করিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—হায় আমার সাধের অন্নপূর্ণা ভিখারীর করে তুলিয়া দিয়া আসিলাম। তিনি আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না, সেইখানেই বসিয়া-বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অন্নপূর্ণার পাষাণী জননীর প্রাণ কিন্তু কিছুতেই গলিবার নয়; মাগীর বড়ই দুঃখ যে, সে অত ক'রে বিষ মিশায়ে খাবারদাবার প্রস্তুত করিল,—সকাল বেলা কি কি বোলে কেঁদে কেঁদে পাড়া মাৎ ক'রে দেবে, সারা রাত জেগে জেগে তার একটা প্রকাণ্ড পালা বাঁধিল; আর ফুস মন্ত্রের চোটে তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল! হায় হায়, এ দুঃখ রাখিবার কি আর স্থান আছে? তাই তিনি অন্নপূর্ণার বিদায়কালে একটুও বিচলিত হন নাই। দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়াও অন্নপূর্ণাকে আশ্বস্ত করেন নাই; আর এখন পতির মুখে তাহার বিদায়বাণী শুনিয়াও তিনি একটুও বিচলিত হইলেন না, পতির বেদনায় সমবেদনা জানাইলেন না। বরং উত্তেজনার স্বরে পতিকে বলিয়া উঠিলেন,—বসিয়া-বসিয়া কাঁদিবার সময় এ নয়; এখন যাও সেই মন্ত্রিপুত্রের কাছে সত্বর এই সমাচার পাঠাইবার ব্যবস্থা করগে; এখনও সময় আছে—চেষ্টা করিলে এখনও অন্নপূর্ণার উদ্ধার হইলেও হইতে পারে; যাও, শীঘ্র যাও, মন্ত্রিপুত্রের নিকটে দুত পাঠাইতে আর কালবিলম্ব করিও না।

স্ত্রৈণ গঙ্গাধর স্ত্রীর আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না; সত্বর

বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দূতপ্রেরণের বন্দোবস্ত করিলেন। একখানি পত্র লিখিয়া দূতের হস্তে দেওয়া হইল। দূতও দ্রুতগতি মন্ত্রিভবনে চলিয়া গেল। মন্ত্রিপুত্রের অগ্রে গিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিল,—"হুজুর, আমি মহানুভব গঙ্গাধর করণের দূত, তাঁহার এই পত্র গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।" মন্ত্রিপুত্র মহা আগ্রহসহকারে দূতের হস্ত হইতে পত্র-খানি লইয়া পাঠ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন। সিংহ-গর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন,—কি, এত বড় স্পর্দ্ধা, শৃগাল হইয়া সিংহের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইবে? তাহা কখনই হইবে না। দূত! তুমি যাও, তাঁহাকে আমার অভিবাদন জানাইয়া বলিও যে, তাঁহা-দের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার চেষ্টা কিছুতেই ব্যর্থ হইবার নয়। এই সসৈন্যে যাত্রা করিলাম, এখনই সেই চোরের উপযুক্ত শাস্তি দিয়া অন্নপূর্ণাকে উদ্ধার করিয়া আনিতেছি। এই পথেই তো আছে, পলাইবে কোথায়?

দূত চলিয়া গেল। এদিকেও সাজ-সাজ রবের মহা সাড়া পড়িয়া গেল। মন্ত্রিপুত্র রণসাজে সাজিয়া সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। সকলেই অশ্বারোহী। পবনবেগে অশ্ব সকল ছুটিল। তাহাদের খুরোত্থিত ধূলিতে চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া পড়িল। ঘনঘন সিংহনাদে ও তুরী-ভেরী প্রভৃতি রণবাদ্যের তুমুল শব্দে আকাশ-মেদিনী ছাইয়া ফেলিল। "এ আবার কি ব্যাপার?" ভাবিয়া রঘুনাথ পালটিয়া দেখিতে-না দেখিতে মন্ত্রিপুত্র সদর্পে যাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল,—আরে রে বর্ব্বর! তুই কি না আমার হৃদয়ের ধন চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছিস্? তোর যদি

জীবনের সাধ থাকে তো সুন্দরীকে আমার হস্তে অর্পণ করিয়া পলায়ন কর, নচেৎ এখনই আপন কর্ম্মের উচিত শাস্তি লাভ করিবি, আমি তোকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইব। ছি ছি ত্থাখ্ দেখি, এই ভাস্বর হীরকহার কি তোর মত বানরের গলায় শোভা পায়? যা, যদি জীবনের সাধ থাকে তো প্রাণ লইয়া পলাইয়া যা, আমি তোকে প্রাণ ভিক্ষা দিতেছি।

রঘুনাথ ত্রস্তে দেখিয়া শুনিয়া অবাক্! পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, অগণিত সৈন্য ধাইয়া আসিতেছে। এ আবার প্রভুর কি লীলা, ভাবিয়া তিনি ভাব-বিভোল হইয়া মন্ত্রিপুত্রের দিকে নির্ভয়-নেত্রে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণার কিন্তু বড় ভয় হইল। তিনি পতিকে জড়াইয়া ধরিয়া ভীতি-কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—স্বামিন্! ঐ সেই মন্ত্রিপুত্র; ঐ দুর্ব্বৃত্তের হস্তেই আমার পিতামাতা আমাকে সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ কালান্তক যমের হস্তে তো আর নিস্তার নাই; ও নিশ্চয়ই তোমাকে বধ করিয়া আমাকে লইয়া যাইবে। ও পাপ আমায় স্পর্শ করিলে কিন্তু আমি এ প্রাণ কিছুতেই রাখিব না। পতিই সতীর গতি। এ বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য আছে, শুনিতে চাই। আর এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায়ই বা কি স্থির করিতেছেন, তাহাও জানিতে-চাই।

সতীর ভীতিমাখা কথা শুনিয়া রঘুনাথ আরও অধিক হাস্য করিতে-করিতে আশ্বাসবচনে তাঁহাকে বলিলেন,—

"মো প্রভু দারুব্রহ্মমূর্ত্তি। এ চ্ছার কেতেক বিপত্তি॥
যে তোতে মোতে ভেট করি। যে বিষতাপুঁ কলে পারি॥

এবে রখিবে সেহি মতে। গো সখি! ভয় কিপাঁ চিত্তে॥
ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি যার পাদে। ধ্যানে চিন্তন্তি অপ্রমাদে॥
সে প্রভু থাউঁ থাউঁ মোর। কিপাঁ তু ডরু নারীবর॥”

সখি লো! তোমার এত ভয় কিসের? তুমি কি জান না, আমার প্রভু যে সেই দারুব্রহ্মমূর্ত্তি জগন্নাথ। আর এই বিপদই বা কতটুকু? সুন্দরি! যিনি তোমার আমার পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছেন, যিনি দুরন্ত বিষতাপ হইতে আমাকে পার করিয়াছেন, এ বিপদেও তিনিই আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। তবে আর তোমার এত ভয়-ভাবনা কেন? ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি দেবগণ অপ্রমত্ত ভাবে ধ্যানযোগে যাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া থাকেন, আমার সেই প্রভু থাকিতে-থাকিতে তুমি অত ভীতই বা হইতেছ কি নিমিত্ত?

রঘুনাথ অন্নপূর্ণাকে এইরূপে প্রভুর গুণ স্মরণ করাইয়া সাহস দিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, দুইজন অশ্বারোহী ক্ষত্রিয় বীর তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। উভয়ের স্কন্ধে উত্তরীয়, পৃষ্ঠ-ভাগে ঢাল, কটিদেশে ‘যমদাঢ়’ অস্ত্র দৃঢ় আবদ্ধ, যেন সাক্ষাৎ বিক্রম সিংহ মহারাজা। অশ্বের উপর হইতেই তাঁহারা জলদগম্ভীর স্বরে রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ-হে, তোমাদের বাড়ী কোন্ দেশে? কোথা হইতে আসিতেছ? যাইবেই বা কোথায়? সঙ্গে সুন্দরী রমণী দেখিতেছি, ইনি কে? আর ঐ যে পাছেপাছে অনেক সৈন্যসামন্ত ধাইয়া আসিতেছে, তাহারাই বা কে? ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

রঘুনাথ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া ধীরেধীরে বলিলেন,—

মহাশয়! এ বড় বিচিত্র ব্যাপার, আদ্যোপান্ত বলিতে গেলে এক-খানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সংক্ষেপ কথা, ইনি আমার পরিণীতা পত্নী, আমি ইহাকে আপন স্থানে লইয়া যাইতেছি, আর ইহারা আমাকে মারিয়া-ধরিয়া আমার পত্নীকে কাড়িয়া লইবার জন্য পাছে-পাছে তাড়া করিয়াছে। আমি তো অনাথ প্রাণী; সখা-সাঙ্গাৎ বন্ধু-বান্ধব আমার কেহই নাই; বল-ভরসা আছেন কেবল সেই নীলাদ্রি-চন্দ্রচূড়ামণি চক্রপাণি জগন্নাথ; তিনি বই আর আমার শরণ লইবার রক্ষা করিবার কেহই নাই; তাই আমরা আকুল প্রাণে তাঁহারই কৃপা প্রতীক্ষা করিতেছি।

বীরদ্বয় বলিলেন,—বটে বটে, এমন ব্যাপার? ভাল, কই কে তোমাদের কাছে আসে,—মার ধর করে একবার দেখি? ভয় নাই, ভয় নাই,—আমরা থাকিতে তোমাদের কোন ভয় নাই, ভয় নাই। আমরা তোমাদের আগুপাছু চলিতেছি, চল তোমরা নির্ভয়ে আমা-দের সঙ্গেসঙ্গে চল। শুনিয়া রঘুনাথ ও অন্নপূর্ণা 'প্রভুরই এ মহিমা' ভাবিয়া পরমানন্দে জননীর পক্ষাচ্ছাদিত পক্ষিশিশুর মত নির্ভয়ে গমন করিতে লাগিলেন। দাসদাসীরাও অগ্রবর্ত্তী বীরের অগ্রেঅগ্রে চলিতে লাগিল। বীরযুগল বুঝি কিছু মায়া জানেন। তাঁহারা মাত্র দুইজন, কিন্তু মন্ত্রিপুত্র কিংবা সৈন্যসামন্ত সকলে দেখিতে লাগিল যে, কোটিকোটি ক্ষত্রিয় বীর রঘুনাথ ও অন্নপূর্ণাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া সকলে ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল এবং যে যেদিকে পাইল, প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। সে পলাইবার রকমই বা কত?

"ভেক ফণীকি দেখি যেছে। ভয়ে পলান্তি এণে তেণে॥

কেশরী দেখি মৃগ গজ। যেহ্নে হুয়ন্তি হতবীর্য্য ॥
গরুড় দেখি যেহ্নে ব্যাল। পলাই পশিলা কি বিল ॥
তেমন্তে প্রাণর আরতে। পলাই গলে যেঝামতে ॥"

সর্প দর্শনে ভেক যেরূপ এদিকে ওদিকে পলায়, কেহ কেহ সেইরূপ ছোড়-ভঙ্গ হইয়া পলাইল। সিংহ দেখিয়া হরিণ ও হস্তী যেমন হতবীর্য্য হইয়া পলায়ন করে, কেহ কেহ সেই প্রকারে পলায়ন করিল। আর গরুড়কে দেখিতে পাইয়া সর্প সকল আকুলি-বিকুলি করিয়া যেরূপ বিলের মধ্যে প্রবেশ করে, সে ভাবেও কেহ কেহ পলাইতে লাগিল। প্রাণের দায়ে কে যে কোথায় পলাইয়া গেল, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই।

রঘুনাথ ও অন্নপূর্ণা কিন্তু ইহার তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। আনন্দবিস্ময়ে তাঁহাদের হৃদয় ভরিয়া গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহারা বীরযুগলের সঙ্গেসঙ্গেই চলিতে লাগিলেন। কেবল মনে হয়,—ইহারা দুইজন কে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জিজ্ঞাসা করিকরি করিয়াও তাঁহারা কিছুতেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

সেই রাজ্যের সীমা পার করিয়া দিয়া ক্ষত্রিয় বীরদ্বয় রঘুনাথকে বলিলেন,—"যাও, এইবার তোমরা নির্ভয়ে গমন কর, আর কোন চিন্তা নাই। আমরাও চলিলাম; আমাদের অনেক কার্য্য।" রঘু অরক্ষিত তাঁহাদিগকে শতশত প্রণাম করিয়া কহিলেন,—বীর-চূড়ামণি! আপনাদের দুইজনের কৃপাতেই আজ আমরা শত্রুহস্তে নিস্তার পাইলাম। আপনারা না রক্ষা করিলে দেখিতে-দেখিতে এখনই আমাদিগকে যমালয়ে যাইতে হইত। আপনারা যেই হউন,

আপনারা আমাদের প্রাণদাতা। আপনাদের চরণে বারবার প্রণাম করি। জানিবেন, আমরা আপনাদেরই হইয়া রহিলাম।

বীরযুগল হাস্যমুখে 'বেশ বেশ' বলিয়া চলিয়া গেলেন। রঘুনাথও দাসদাসীকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া বিদায় দিয়া অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া চলিলেন। কিন্তু চিনিতে পারিলেন না যে, এই দুইটী ক্ষত্রিয়বীর কে? হায় যদি রঘুনাথ চিনিতে পারিতেন যে, ইহারাই তাঁহার প্রাণনাথ বলভদ্র জগন্নাথ, তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকিত? তিনি তাঁহা হইলে তাঁহার সকল সাধ এইখানেই মিটাইয়া লইয়া তবে তাঁহাদের ছাড়িয়া দিতেন। যাঁহার মায়ায় অমরবৃন্দও বিমোহিত, সামান্য মানব তাঁহাকে চিনিবেই বা কি প্রকারে? মায়াধীশ জগদীশ ভৃত্যের দুঃখ দূর করিয়া নীলকন্দরে শুভবিজয় করিলেন। রঘুনাথ তাঁহাদের চিনিতে পারুন আর না-ই পারুন, করুণাময় জগন্নাথের করুণাতেই যে তিনি রক্ষা পাইলেন, এ বিষয়ে আর তাঁহার অণুমাত্র সংশয় রহিল না; তিনিও সেই প্রভুরই করুণা ভাবিতে-ভাবিতে চলিতে লাগিলেন।

পথে বাহির হইলে আপদ্-বিপদ্ আছেই আছে। প্রভুরই করুণায় সকল আপদে পার হইয়া তাঁহারা কিছুদিন পরে শ্রীনীলাচলে গিয়া পঁহুছিলেন। আজ আর তাঁহাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। উভয়ে শ্রীমন্দিরে যাইয়া তৃষিতনয়নে নীলাচলচন্দ্রের রূপসুধা পান করিলেন। পথের সকল ক্লেশ দূর হইয়া গেল। অন্নপূর্ণার পিতা আসিবার সময় যাহা কিছু ধনরত্ন দিয়াছিলেন, তাহা দিয়া তাঁহারা দেউলের দক্ষিণপার্শ্বে একটি বাটী খরিদ করিলেন এবং

তথায় পরমানন্দে বসবাস করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ কিন্তু তাঁহার ভিক্ষা বৃত্তি পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি প্রতিদিন প্রভুর শয্যোত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া আবার শয়ন পর্য্যন্ত আরাত্রিক-ভোগ-শিঙ্গার প্রভৃতি লীলা দর্শন করেন, আর যে সময় দর্শন না হয়, সেই সময় ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ান। ভিক্ষা করেন বটে, কিন্তু ভিক্ষার জন্য ক্ষেত্রসীমার বাহিরে কখনও গমন করেন না। কৃষ্ণকথা ছাড়া তাঁহার মুখে আর অন্য কোন কথা নাই; গোবিন্দগীতি ছাড়া আর অন্য কোন গান করা নাই। তা ভিক্ষাকালেই কি, শ্রীমন্দিরেই কি, আর গৃহেই বা কি। শ্রীমন্দিরে তিনি যখন 'কলারাট-ঘরে' (জগন্নাথের ঠিক সম্মুখে ভাণ্ডারঘরের দক্ষিণপার্শ্বে) করতাল বাজাইয়া গোবিন্দগীতি গাইতে-গাইতে নৃত্য করিতে থাকেন, আহা তাঁহার তখনকার সেই পুলকপূর্ণ অশ্রুস্নাত পূতমূর্ত্তি কি সুন্দর—কি সুন্দর! যে দেখে, সে জগন্নাথ দেখিবে, কি তাঁহাকে দেখিবে, কিছুই স্থির করিতে পারে না।

ভাবসাগর ভগবানের ভাব লইয়াই ভক্তের ভাব। ভক্তের ভাব আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু ভগবানের ভাব অধিকার করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভগবান্ অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি,—ভাব-মাধুর্য্যের ভাণ্ডার। তাই তাঁহার রসে রসিয়া তাঁহার ভাবে মজিয়া ভক্ত যখন বিভোর হইয়া নাচিতে গাইতে থাকেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে পামরপাষণ্ডেরও নয়ন ভুলিয়া যায়—মন-প্রাণ গলিয়া যায়। ভাব-বিভোর ভক্তকে দেখিয়া ভগবান্‌কে দেখিলে সে-যে কি সুন্দর কি মনোহর দেখায়, তাহা যে দেখিয়াছে, সে-ই বুঝিয়াছে; অন্যকে

বুঝাইবার নহে। তখন যেন সেই ভগবান্‌ই আর এক রকম হইয়া পড়েন,—তখন যেন সেই কাষ্ঠ-পাষাণ-ধাতুমূর্ত্তি ভেদ করিয়া ভাবে-ভরা রসেপোরা কি এক মধুরমধুর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে। এ মূর্ত্তি কখনও দেখিয়াছ কি ভাই? যদি না দেখিয়া থাক তো ঐ ভাব-বিভোর রঘুনাথকে মানসচক্ষে দেখ, আর তাঁহার সম্মুখে ঐ জগন্নাথকে দেখ—এঁকে দেখিয়া ওঁকে দেখ, আবার ওঁকে দেখিয়া এঁকে দেখ, চিরমধুর চিরনবীন মাধুর্য্য-সাগরে তুমিও ডুবিয়া যাইবে।

রঘুনাথ এইরূপে কখনও কলারাটগৃহে নৃত্য করেন, কখনও জগমোহনে আসিয়া গড়াগড়ি দিতে থাকেন, কখনও বা গরুড়ের পশ্চাতে দুই বাহু তুলিয়া দাঁড়াইয়া আপনার অন্তরের কথা প্রভুকে বিজ্ঞাপিত করেন। ফল কথা, তিনি অন্তরে-বাহিরে হরিময় হইয়া সেই হরিক্ষেত্রে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষা করিয়া যাহা পা'ন, তাহা পতিব্রতা অন্নপূর্ণার হস্তে আনিয়া দেন। অন্নপূর্ণা তাহা দেবী অন্নপূর্ণার মত পরমানন্দে পাক করেন এবং অতিথি-অভ্যাগত সাধুসন্ন্যাসীকে ভোজন করান; পরে পতিকে আহার করাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে নিজেও ভোজন করেন। কিন্তু পতির ভোজন না হইলে সতী বারিবিন্দুও পান করেন না। পতিই তাঁহার পরমারাধ্য পরম দেবতা শ্রীপতি।

রঘু অরক্ষিতের ভাবময় নর্ত্তনগীতি ও ভগবানে ভক্তিই তাঁহাকে অল্পকালের মধ্যে সকলের প্রীতিশ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিল। বৈষ্ণব-সেবনের গুণেও অন্নপূর্ণার নাম দেশেদেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

তাঁহারা সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া হরিভজনে মজিয়া রহিয়া সেই হরিক্ষেত্রেই মানবজন্ম সার্থক করিতে থাকিলেন।

উৎকল-কবি বিপ্র রামদাস এই ভক্তচরিত্র বর্ণনার অবসানে দশেন্দ্রিয়াধিপতি মনের প্রতি সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

"ভগত নিমন্তে শ্রীবৎস। হুয়ন্তি সে এড়ে সপক্ষ ॥
কেবল নির্ম্মল হৃদয়ে। ডাকিলে লক্ষে যোজনরে ॥
পাশে ডাকিলা প্রায়ে মনি। তাকু রখন্তি চক্রপাণি ॥
কুটিল হৃদ যেউ নয়। সে ডাকু রহিণ পাশর ॥
তাকু বধিরজন মতে। শুনন্তি নাহিঁ কদাচিতে ॥
এণু বিশ্বাস একা মূল। শুন হে মন মহীপাল ॥"

মন! তুমিই না এ দেহরাজ্যের রাজা। রাজার আদেশ প্রজার মত সকল ইন্দ্রিয়ই তো তোমার আদেশ অবনতমস্তকে বহন করিয়া থাকে। তাই তোমাকেই দেখাই, তুমি দেখিলেই আর সকলেই দেখিতে পাইবে বলিয়া তোমাকেই দেখাই, দেখ দেখি একবার, ভক্তরক্ষার নিমিত্ত শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবান্ কত সহায় কত সপক্ষ হইয়া থাকেন? আহা, সেই চক্রপাণি চিন্তামণি যদি লক্ষ যোজন দূরেও অবস্থান করেন, আর কেহ তাঁহাকে নির্ম্মল হৃদয়ে আহ্বান করিতে থাকে, তাহা হইলে তিনি—"বুঝি এই আমার পাশে হইতেই কেহ আমাকে ডাকিল" মনে করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ রক্ষা করিয়া থাকেন। আর যদি কেহ কুটিল হৃদয় লইয়া তাঁহার গা ঘেঁসাঘেঁসি থাকিয়াও তাঁহাকে গলাবাজি করিয়া ডাক দিতে থাকে, তাহা হইলে সেই চিকণকালা কালারই মত সে কথা কখনও কাণে তুলেন না,—যেন শোনেনই নাই। কিন্তু মন! জানিও, এ বিষয়ে বিশ্বাসই

হইতেছে একমাত্র মূল। যদি বিশ্বাস কর তো সততই তাঁহার দয়ার হস্ত ইতস্তত দেখিতে পাইবে,—করুণার অমিয়-ঝঙ্কারে কর্ণযুগল শীতল করিতে পারিবে। বিশ্বাস কর মন! বিশ্বাস কর। ঈশ্বরে—তাঁহার শক্তিতে—তাঁহার অলৌকিক আচরণে বিশ্বাস কর মন! বিশ্বাস কর। তাহা হইলে তোমাকে আর তাঁহার তত্ত্বনিরূপণ করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

আমরা আর কি বলিব, কেবল করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি, উৎকল কবির এই কোমল-কান্ত পদাবলী যেন অমূল্য মণি-মালিকার মত বিশ্ববাসীর কণ্ঠেকণ্ঠে বিরাজ করিতে থাকে,—আর সরল বিশ্বাসের উজ্জ্বল আলোকে যেন সকলের অন্তর-বাহির আলোকময় হইয়া উঠে।

দামোদর দাস।

দামোদর দাসের নিবাস কাঞ্চীনগরে। জাতিতে ব্রাহ্মণ। পুত্র নাই, কন্যা নাই, আছেন কেবল একমাত্র পত্নী। ভিক্ষাই তাঁহার জীবিকা। সমগ্র সংসার খুঁজিয়া তাঁহার মত আর একটি দরিদ্র ভিখারী পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান-আহ্নিক সারেন, দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ তিলক রচনা করেন, মস্তকের উপর নির্ম্মাল্য তুলসীদল ধারণ করেন, এবং মুখে 'রাম কৃষ্ণ হরি' নাম কীর্ত্তন করিতে-করিতে ভিক্ষার নিমিত্ত নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন করিতে থাকেন, আবার সন্ধ্যা হইলে গৃহে ফিরিয়া আসেন। ভিক্ষায় কিছু জুটিলে ভালই ; না জুটিলেও প্রাণে অসন্তোষ নাই। তিনি ভিক্ষালব্ধ যাহা-কিছু পতিপ্রাণা পত্নীর হস্তে আনিয়া দেন, পত্নীও পরমানন্দমনে তাহা পাক করেন এবং ভগবানকে অর্পণ করিয়া উভয়ে প্রসাদ পাইয়া থাকেন। ইতিমধ্যে যদি কোন ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আসিয়া উপস্থিত হন, তবে তাঁহারা তাঁহাদেরই অগ্রে সেবা করান, পরে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তো তবেই সেদিন তাঁহাদের উদর ভরণ হইল, নচেৎ উপবাসী থাকিতেও তাঁহারা কাতর নহেন, তাহাতেও তাঁহাদের পরমানন্দ।

পতি-পত্নীর প্রধান কার্য্য হইতেছে গোবিন্দ-ভজন। তাহাতেই তাঁহারা অহর্নিশ মাতিয়া আছেন। পরচর্চ্চা নাই, কাহারও গ্লানি করা নাই ; হৃদয় তাঁহাদের জীব-দয়ায় সদাই বিগলিত। অত

যে অভাব, কিন্তু ভগবানের কাছে তাঁহারা নিজের জন্য কিছুই চাহেন না, চাহেন কেবল জীবের মঙ্গল। পতিপত্নী হরিভজন করিতে-করিতে যখনই হরির দেখা যেন পেয়েছি-পেয়েছি মনে করেন, তখনই তাঁহার কাছে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করেন,—মঙ্গলময়! জগতের জীব তো তোমার মঙ্গলময় মূর্ত্তি দেখিল না, মঙ্গল ভাবিয়া অমঙ্গলকেই তাহারা আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, ঠাকুর! তাহাদের প্রতি দয়া কর;—তাহাদের ভ্রান্তি দূর করিয়া দাও,—তোমার আনন্দ-মন্দাকিনীর পূতধারায় তাহারা অভিষিক্ত হউক,—হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া সকলেই সকলকে ভালবাসিতে শিখুক, তোমার সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্য মূর্ত্তি সকলের হৃদয়ে-হৃদয়ে জাগরূক রহুক।

চর্ম্মমধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও মৃগনাভির গন্ধ ফুটিয়াই বাহির হয়। দামোদর দাসেরও যশোগন্ধ সেই ছিন্নকন্থা বা জীর্ণ পর্ণকুটীরের আবরণ মানিল না, সে-ও তাহা ভেদ করিয়া দেশেদেশে ছড়াইয়া পড়িল; এ-দেশ ও-দেশ যাইতে-যাইতে ক্রমশ সেই আসল দেশে,—যে দেশে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না—সেই আমাদের আসল দেশেও যাইয়া পঁহুছিল। সে দেশের রসিক রাজা অমনি সেই গন্ধ ধরিয়া কাঞ্চীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য—জিনিষটা আসল কি নকল, একবার বুঝে দেখা। রাজা বড় মায়াবী। আসিয়াই তিনি এক মায়া-সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি ধরিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, গলে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকে জটা, কর্ণে তাম্র-কুণ্ডল। দুর্ব্বল বৃদ্ধ শরীর—যেন একটি পা চলিবার শক্তি নাই।

যষ্টি-হস্তে ধীর-পদ-বিক্ষেপে তিনি দামোদর দাসের দ্বারদেশে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

এদিকে দামোদর দাস সেদিন ভিক্ষায় একমুষ্টি তণ্ডুলও পান নাই, রিক্ত-হস্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন; পতি-পত্নী উভয়ে ক্ষুৎক্ষাম-দেহে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া চিন্তামণির চরণ চিন্তা করিতেছেন। মনেমনে বলিতেছেন,—

"ভো প্রভু দীনজনবন্ধু। নাম করুণাময় সিন্ধু॥
অরক্ষ-রক্ষণ তো বাণা। ভৃত্য-দুরিত-বজ্র-সেহ্ণা॥
দুর্জ্জন-মণ্ডুকর ফণী। জগত-জন-চিন্তামণি॥
গর্ব্বিত-করীর কেশরী। সকল জীবে অধিকারী॥
তেণু শরণ গলি তোতে। আতঙ্কু রক্ষা কর মোতে॥
এড়ে নিষ্ঠুর সময়রে। যেবে অতিথি মোর দ্বারে॥
আসিন হইব প্রবেশ। তাহাকু দেবি মুহিঁ কিস॥"

ঠাকুর! তুমি প্রভু;—নিগ্রহ করিলে করিতে পার, অনুগ্রহ করিলেও করিতে পার। কিন্তু দীনের তো আর কেহই নাই, তুমিই তাহাদের একমাত্র বন্ধু। তাই না তোমায় লোকে করুণার অপার সাগর বলিয়া ডাকিয়া থাকে। যাহাদের আর রক্ষা করিবার কেহই নাই, তাহাদিগকে রক্ষা করিবে বলিয়াই না তুমি তোমার চক্রে নিশান উড়াইয়াছ। ঠাকুর! তুমি বজ্র-বর্ম্মের মত তোমার ভৃত্যের অঙ্গে রহিয়া তাহার সমস্ত দুরিত দূর করিয়া দাও। নাথ! তুমি দুর্জ্জন-রূপ ভেকের কালান্তক কালসর্প। তুমি জগতবাসি-জনের অমূল্য চিন্তা-মণি। তুমি গর্ব্বমদে মত্ত মানব-মাতঙ্গের বিনাশকারী কেশরী।

তুমি সকল জীবেরই অধিপতি। তাই আজ এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাধমও তোমার শরণাগত হইয়াছে। তাহাকে তাহার আতঙ্ক হইতে রক্ষা কর প্রভু! রক্ষা কর। আতঙ্ক আর কিছুই নয় ঠাকুর, এ দাস মহামহিম নামমন্ত্রের মহাপ্রভাবে জাগতিক তুচ্ছ আতঙ্ক কি, মরণভয়েও ভীত নহে, সে আতঙ্কনাশের জন্যও সে প্রার্থনা করিতেছে না। তাহার ভয়—যদি এই দুরন্ত সময়ে তাহার দ্বারে কোন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হন, তবে তাঁহার সেবা নির্ব্বাহ হইবে কি প্রকারে?

যেখানেই বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। দামোদর দাস ও তাঁহার পত্নী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাদের নয়নজলে ধরিত্রী আর্দ্র হইয়া যাইতেছে; আর এমনই সময় তাঁহাদের কর্ণে অতিথির করুণ স্বর যাইয়া প্রবেশ করিল,—"ঘরে কে আছ হে, আমি অতিথি তোমাদের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছি।" অতিথির কাতর কণ্ঠস্বর কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিবা মাত্রই দামোদর দাস শশব্যস্তে বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, শ্রান্তক্লান্ত জরাজীর্ণ জ্যোতির্ম্ময় যোগী মহাপুরুষ। তিনি ভক্তিভরে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং অতি বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বামিন্! দাসের প্রতি কি অনুমতি হইতেছে, অকপটে প্রকাশ করুন।" মায়াযোগী বলিলেন,—"বাপু হে! তোমার বড় কীর্ত্তি শুনি—তুমি নাকি অতিথি-অভ্যাগতকে পরমাদরে ভোজন করাও। আমি তো যার-তার বাড়ী আহার করি না;—অতিথিসেবায় যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে আহারের জন্য যাচা-

যাচি করিলেও আমি তাহার দিকে ফিরিয়া দেখি না, কিন্তু শ্রদ্ধালু অতিথিভক্তের অন্নই আমি আপনি চাহিয়া ভোজন করিয়া থাকি। অতিথি-সেবকের মধ্যে তোমার নামটা প্রায়ই কাণে আসে, তাই তোমার অন্নে বড় লোভ হইল; আজ মনে হইল—যাই একবার দামোদর দাসের বাড়ী ভোজন করিয়া আসি; তাই বাবা! এসেছি,—প্রাচীন শরীর চলা-ফেরা করা ভার, তবুও তোমার অন্ন ভোজনের লোভেই এসেছি, এখন একমুষ্টি অন্ন দিবে কি না বল।"

হায় হায়, দামোদর দাস যে আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই অশঙ্কাই তাঁর উপস্থিত! অতিথির কথা শুনিয়া তিনি বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কি করেন, শ্রীহরির যাহা ইচ্ছা, ভাবিয়া তিনি শীতল সলিলে যোগিবরের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং মিষ্টবাক্যে বলিলেন,—ঠাকুর! আপনাকে বড়ই পথশ্রান্ত দেখিতেছি, আপনি এই তৃণাসনে একটু বিশ্রাম করুন, আমি এখনই আসিতেছি। বলিয়া তিনি পত্নীর নিকটে গমন করিলেন এবং অনুচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন,—সতি! দ্বারে অতিথি উপস্থিত, ভোজন ভিক্ষা করিতেছেন, ঘরেও তো কিছুই নাই, এখন কি উপায় করা যায় বল?

পত্নী বলিলেন,—স্বামিন্! আমায় জিজ্ঞাসা করাই বৃথা। তোমার তো আর অজ্ঞাত কিছু নাই। ঘর-দ্বার বেচিলেও আমাদের এক পণ কৌড়ি হওয়া কঠিন। হায়, যদি একখানি বস্ত্র থাকিত, তাহা হইলেও তাহা বেচিয়া কিছু-না-কিছু পাওয়া

যাইত; তাহাও তো নাই নাথ! ছেঁড়া নেকড়া আর মাটীর জল-পাত্রই আমাদের একমাত্র সম্বল; তাহার বিনিময়ে কে আর আমাদের কৌড়ি দিতে যাইবে? এই বলিয়া সতী অধোবদনে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া দামোদর দাসের নয়নও অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কেবল বলিলেন,—তবে কি হবে সতি! তবে কি হবে? তবে কি অতিথি-সেবা হবে না? হায় হায়, দ্বার হইতে অতিথিই যদি ফিরিয়া গেলেন, তবে আর ছার জীবনে প্রয়োজন? গোবিন্দ হে! এ কঠোর পরীক্ষা কেন প্রভু?

পতির অবস্থা দেখিয়া পতিব্রতার বড় ভয় হইল, ভাবনায় তাঁহার শরীর থরথর কাঁপিয়া উঠিল; তিনি একান্ত মনে আকুল প্রাণে সেই অকুলের কাণ্ডারী শ্রীহরিকে ডাকিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি যেন চমকভাঙ্গা হইয়া পতির প্রতি হাসিহাসি মুখে বলিয়া উঠিলেন,—স্বামিন্, অত কাতর হইতেছ কেন? আমাদের প্রভু যে সেই জগন্নাথ; নিশ্চয়ই তিনি অতিথির অন্ন দিবেনই দিবেন। এখন তুমি এক কাজ কর, শীঘ্র নাপিত-ভবনে গিয়া একখানি 'ক্ষুর' চাহিয়া আন। তার পর যাহা করিতে হইবে বলিতেছি।

দামোদর দাস কি করেন, তিনি তাড়াতাড়ি নাপিত-গৃহ হইতে একখানি ক্ষুর চাহিয়া লইয়া আসিলেন। পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল, এখন কি করিতে হইবে? পত্নী হাঁসিতে-হাঁসিতে তাঁহার কেশদাম দেখাইয়া বলিলেন,—দেখ, আমার এই কেশ-

রাশির অর্দ্ধাংশ ঐ কাতুরী দিয়া কাটিয়া ফেল, তার পর দুজনে মিলিয়া চুল-বাঁধিবার দড়ি তৈয়ারি করিয়া ফেলি; আর তুমি গিয়া সেগুলি বেচিয়া কৌড়ি আন, অতিথিসেবার ভাবনা কিসের?

দামোদর দাস মনেমনে সহধর্ম্মিণীর শত ধন্যবাদ দিতেদিতে স্বহস্তে তাঁহার মস্তকের চারিধারের কেশগুলি রাখিয়া দিয়া মধ্য-ভাগের কেশগুচ্ছ পুঁছিয়া কাটিয়া লইলেন এবং দুইজনে তাড়াতাড়ি দড়ি বিনাইতে বসিয়া গেলেন। যত শীঘ্র সম্ভব এক রকম মোটা-মুটি দড়ি বিনানো হইয়া গেল। দামোদর দাস তাহা বিক্রয় করিতে লইয়া গেলেন। ভাগ্যবশে পথেই একজন খরিদ্দার জুটিয়া গেল। পাঁচপণ কৌড়ি দিয়া দড়িগুলি সে কিনিয়া লইল। দামো-দরও মহানন্দ-মনে সরু চাউল, মুগের বিয়লী, ঘৃত, নবাত, দুগ্ধ, দহি, তরি-তরকারি প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়া পত্নীর সমীপে হাস্য-মুখে উপস্থিত হইলেন। পতিব্রতা পাককার্য্যে বড়ই নিপুণা; দেখিতে-দেখিতে তিনি অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। দামোদর দাস মহা হর্ষমনে সাদর-সম্ভাষণে অতিথিদেবতাকে গৃহ-মধ্যে আনয়ন করিলেন। পতি-পত্নী উভয়ে মিলিয়া পরমাদরে তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। দুইজনে ভক্তিভরে সেই জল কিঞ্চিৎ পান করিলেন, কিঞ্চিৎ মস্তকে ধারণ করিলেন। আহা, এখন তাঁহাদের আনন্দ রাখিবার আর স্থান নাই।

অহো, আজ ইহাঁদের কি ভাগ্য! ব্রহ্মা আপন কমণ্ডলুতে ভরিয়া রাখিয়াও যে জল একবিন্দু লাভ করিতে পারেন নাই,

আর ইঁহারা কিনা আজ আপন ঘরে বসিয়া তাহা সাধ মিটাইয়া পান করিয়া লইলেন! কারণ আর কিছুই নয়,—

"ভাবকু নিকট গোসাঁই। অভাবলোকে ভেট নাহিঁ ॥"

অন্তরের বিশুদ্ধ ভাব লইয়াই কথা। যেখানে ভাব-কদম্ব ফুটিয়া উঠে, মধুলম্পট মধুকরের মত গোঁসাই (প্রভু—ভগবান্) তাঁহার সেই ভাবগন্ধ ধরিয়া আপনি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হন। কিন্তু অ-ভাব অর্থাৎ ভাবহীন ব্যক্তি কিছুতেই তাঁহার ভেট বা দর্শন লাভ করিতে পারে না। তাই না সাধক কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—

"সে যে ভাবের মানুষ ভাব ব্যতীত অ-ভাবে কে ধ'র্ত্তে পারে ॥"

একখানা ভাঙ্গা পিঁড়া ছিল। পতিপত্নী তাহাই পাতিয়া দিয়া আদর করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। একখানি কলাপাতা বিছাইয়া তাহার উপর অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেন। শ্রীগোবিন্দও মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। বুড়া মানুষ, বড় বেশী খাইতে পারিবেন না, ভাবিয়া তাঁহারা অধিক অন্ন-ব্যঞ্জন তাঁহাকে দেন নাই; দেখিতে-দেখিতে সেই সামান্য অন্ন-ব্যঞ্জন সমস্তই মায়া-বৃদ্ধ উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন,—আর কিছু থাকে তো আমায় দাও, উত্তম পাক হইয়াছে; ভারি তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিতেছি। দামোদর দাসের পত্নী অমনি তাড়াতাড়ি গিয়া অবশিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জন যাহা কিছু ছিল সমস্ত আনিয়া অতিথির পত্রে পরিবেশন করিলেন। অন্তর্যামী জানিলেন যে, ইহাদের ঘরে খাদ্যদ্রব্য আর কিছুই নাই, তিনি সেই অন্ন-ব্যঞ্জন-

গুলি চাঁচপোঁচ করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। পরে আচমন করিয়া বসিয়া-বসিয়া হরিতকী ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে থাকিলেন,—অহো, ইহাদের জীবন ধন্য! ঘরে কিছুই নাই, সম্বলের মধ্যে ছেঁড়া নেকড়া এবং ভাঙ্গা ভাঁড়, তবুও কিন্তু অতিথি-সেবায় কি অপূর্ব্ব অনুরাগ! এই যে আজ আমাকে সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন আহার করাইয়া ইহারা উপবাসী রহিয়াছে, কই তাহা-তেও তো ইহাদের অসন্তোষ কিছুই দেখিতেছি না। আশ্চর্য্য! যে কেশের জন্য রমণী কতই না কি করিয়া থাকে, অতিথিসেবার জন্য সে কেশেও তো দাসপত্নীর অণুমাত্র আসক্তি দেখা গেল না। ইহাদের জোড়া কি আর জগতে মিলে? ভগবান্ ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়া এইরূপ কত কি ভাবিলেন, কিছুক্ষণ পরে দামোদর দাসকে আপন সমীপে ডাকিয়া বলিলেন,—ওহে ভক্ত! তোমাদের সেবায় বড় সন্তোষ লাভ করিয়াছি; তা বাপু! দেখিতে-দেখিতে রাত্রিটাও হইয়া পড়িল, বৃদ্ধ শরীর, আজ আর চলিয়া যাওয়া পোসাইবে না দেখিতেছি, রাত্রিটা এ ইথানে কাটাইয়া কল্য প্রাতেই চলিয়া যাইব এখন। তা, আমার জন্য আহারের আয়োজন বড় বেশী কিছু করিতে হইবে না, এই 'এক ওলি' (ছোট মাটির ভাঁড়ের এক ভাঁড়) অন্ন হইলেই আমার চলিয়া যাইবে।

দামোদর দাস 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পত্নীর নিকট গমন করিলেন এবং চিন্তা-মলিন-মুখে বলিলেন,—সতি! অতিথির আজ আর চলিবার শক্তি নাই, রাত্রিটা তিনি এইখানেই কাটাইবেন, বলিতে-

ছেন। আহারের জোগাড়ও তো চাই, এখন উপায়? পতিব্রতা হাসি-হাসি মুখে বলিয়া উঠিলেন,—তার আর চিন্তা কি? এই বাকি চুলগুলি কাটিয়া ফেল; আবার দুজনে বসিয়া চুলবাঁধা দড়ি বিনাইয়া ফেলি, তার পর তুমি গিয়া সেগুলি বেচিয়া চাল দাল আদি কিনিয়া আন; তার আর অত ভাবনা কেন? পত্নীর কথা শুনিয়া দামোদর দাস তাঁহাকে শতশত সাধুবাদ দিলেন এবং কাতুরী (ক্ষুর) দিয়া তাঁহার মাথার সমস্ত চুলগুলি পুঁছিয়া কাটিয়া লইলেন। পরে দুজনে বসিয়া দড়ি বিনাইয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বের মত সেই দড়ি বিক্রয় করিয়া পাঁচ পণ কৌড়ি পাইলেন এবং তাহাতেই চাল দাল প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন। পত্নীও হর্ষভরে রন্ধন করিতে বসিয়া গেলেন। আহা, সধবার আজ বিধবার ভাব দেখিলে চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে। তিনি কেশহীন মস্তকে একটু কানি বাঁধিয়া রাখিয়া দিয়াছেন মাত্র। পুণ্যবতী সতীর আত্মদানেই আজ অতিথিসেবা হইল, ভাবিয়া দামোদর দাস আনন্দ অনুভব করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িলেই, সেই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনি আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছেন না।

রান্না-বান্না হইয়া গেল, আবার তাঁহারা অতিথিকে আদর করিয়া আহার করাইলেন। এবারেও ভগবান্ 'আরো দাও আরো দাও' করিয়া সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জনই খাইয়া ফেলিলেন, পিপীলিকার প্রত্যাশার মতও পাতে কিছুই রাখিলেন না। আচমনাদি হইয়া গেল। দামোদর দাস তাঁহার শয়নের জন্য এক

খানি ছিন্ন তৃণাসন বিছাইয়া দিলেম। তিনিও তাহাতেই শয়ন করিলেন।

“যার আসন নাগরাজ। আবর বিনতা-আত্মজ॥
মুনিষ্ক হৃদয়কমল। রুদ্রদেবতা-বক্ষঃস্থল॥
সে পুনি ভগত-ভাবরে শোইলে তৃণশয্যাপরে॥”

হায় হায়, নাগরাজ অনন্তদেব, বিনতানন্দন গরুড়ের পৃষ্ঠদেশ, মুনিগণের হৃদয়-কমল এবং রুদ্রদেবতার বক্ষঃস্থল যাঁহার আসন, ভক্তের ভাবের বলিহারি যাই, আজ সেই ভাবের প্রভাবে তিনি কিনা তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন! অহো, ধন্য সেই ভক্তের বিশুদ্ধ ভাব, আর ধন্য সেই ভাবাধীন ভগবান্!

দামোদর দাস তখন ধীরেধীরে প্রভুর পাদ সংবাহন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পত্নী ছিন্ন বসনের অঞ্চল দিয়া আস্তেআস্তে বাতাস করিতে থাকিলেন। আর ভাবে-ভোলা ভগবান্ বৈকুণ্ঠের সুখ তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করিয়া যেন নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

অতিথিকে নিদ্রিত দেখিয়া সুন্দরী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, —আহা, অতিথি ঠাকুর বড়ই বৃদ্ধ, এই অশক্ত শরীরে ইনি কালই বা কি প্রকারে পথ চলিয়া যাইবেন? কল্য প্রাতঃকালে উঠিয়াই তুমি ভিক্ষা মাগিতে গমন করিও, ভাগ্যে যাহা মিলিবে, তাই দিয়াই ইঁহার সেবা করা যাইবে, তারপর আমরা আজিকার মত কল্যও উপবাসী রহিব। যেমন স্ত্রী, তেমনই স্বামী; তিনিও অমনি বলিয়া উঠিলেন,—হাঁ হাঁ সেই কথাই ভাল।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার যিনি অতীত, তাঁর

আবার জাগাই বা কি, আর ঘুমানই বা কি? ভগবান্ শুইয়া শুইয়া সকলই শুনিতেছেন, শুনিতে-শুনিতে তাঁহার নয়ন-কমল ছল-ছল করিয়া উঠিল। ঐ যে—ঐ যে নয়নের কোণ দিয়া করুণার ধারাও যে গড়াইয়া পড়িল। আহা, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দুইজনকে মায়ানিদ্রায় অভিভূত করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। দেখিলেন,—পতি-পত্নী তাঁহার চরণতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া করিলেন কি? প্রথমেই তিনি পতিব্রতার মুণ্ডিত মস্তকে শ্রীহস্ত বুলাইতে-বুলাইতে বলিতে লাগিলেন,—পতিব্রতে! মা! মা!—আহা কি মিষ্ট, কি মিষ্ট,—আবার বলি—মা! মা! তোমার মস্তক কুঞ্চিত-কেশ-কলাপে পূর্ণ হইয়া যাউক; মা! মা! তোমার সকল শরীর নানা মণিমাণিক্য অলঙ্কারে ঝলমল করিয়া উঠুক; মা! মা! তোমার অঙ্গেঅঙ্গে ষোড়শী রূপসীর সৌন্দর্য্যসুষমা তরঙ্গায়িত হইতে থাকুক। শ্রীহরির শ্রীমুখের কথা ফুরাইতে-না-ফুরাইতে তাঁহার তাহা তাহাই হইতে লাগিল, দেখিয়া আনন্দময়ের আনন্দ যেন উত্তরোত্তর বাড়িয়া-বাড়িয়াই উঠিতে লাগিল। তিনি এইবার দাঁড়াইয়া উঠিলেন। চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। করুণা-কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন,—কুটীর! তুমি অট্টালিকা হও। তাহাই হইল। প্রভু আবার এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিলেন,—গৃহ-দ্বার ধনরত্নে পুরিয়া যাও। তাহাই হইল। প্রভু তখন হর্ষমনে পতি-পত্নীর মস্তকে দুইটি করপদ্ম রাখিয়া ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ-আশীর্ব্বাদের অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আধ আধ মধুময় ভাবে বলিলেন—

"জীবন্তে সুখী হোই থাঅ। অন্তে বৈকুণ্ঠ গতি পাঅ॥"
ওগো তোরা সুখেসুখে জীবন অতিবাহিত কর, আর জীবন ফুরাইয়া গেলে বৈকুণ্ঠ-গতি লাভ কর। আমি তোদের জীবনে-মরণে সঙ্গের সাথী হইয়া রহিলাম।

ভক্তযুগলকে অমিয়ময় আশীর্ব্বাদে সম্বর্দ্ধিত করিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। নিশার অবসানে সতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। নয়ন মেলিয়া দেখেন, এ কি আচম্বিত কথা, সেই আমি কি এই আমি? কই, আমার পরিধানের ছেঁড়া নেকড়া কোথায় গেল, এ যে দেখিতেছি, বহুমূল্য বস্ত্র। ওঃ আমার গায়ে এত গহনা কোথা হইতে আসিল? মাথায় হাত দিয়া তিনি আরও অধিক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন,—তাইতো এ নেড়া মাথা,—রাতারাতি রাশিরাশি চুল গজাইল কি প্রকারে? তারপর সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন—জীর্ণ শীর্ণ রুক্ষ দেহে আদ্য-যৌবনের ঢলঢল লাবণ্য কোথা হইতে আসিল? হায় হায়, আমি কি খেয়াল দেখিতেছি? কই, সেই অশক্ত-শরীর অতিথিই বা কোথায় গমন করিলেন? তাঁহাকেও তো দেখিতে পাইতেছি না? সতী সেই ভূমিশয্যা হইতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। এদিক-ওদিক চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর তাঁহার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। দেখিলেন,—সে পর্ণকুটীর নাই, সে তৃণশয্যা নাই, সে ভগ্ন মৃত্তিকাভাণ্ড নাই, আর সেই শতগ্রন্থি বস্ত্রখণ্ডও নাই;—এ যে প্রকাণ্ড অট্টালিকার প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ, মহামূল্য মণিমাণিক্য এবং ধন-ধান্য বসন-ভূষণে ভরিয়া

রহিয়াছে। অহো, পতিও যে আমার দিব্য কন্দর্পমূর্ত্তি হইয়াছেন। কি বিচিত্র ব্যাপার! অবলা ব্যগ্রভাবে নিদ্রিত পতির হস্ত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—নাথ! দেখ দেখ কি বিচিত্র—কি বিস্ময়কর ব্যাপার। দামোদর দাস নিদ্রিত-নেত্রে 'কি কি' বলিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং দুই হস্তে দুইটি চক্ষু রগড়াইয়া লইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। সতীর আর বিলম্ব সহিল না, তিনি ব্যস্তসমস্তভাবে পতির হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—ওগো, এখানকার দেখা-টেকা এখন রেখে দাও, চল—সত্বর বাহিরে দেখ্‌বে চল, সে অতিথি ঠাকুর গেলেন কোথায়? তিনি সামান্য লোক নন গো সামান্য লোক নন। দামোদর দাস অমনি উঠিপড়ি করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দেখিলেন,—সাবেক আর কিছুই নাই, সকলই নূতন হইয়া গিয়াছে,—দুঃখদারিদ্র্যের ভস্মস্তূপ ভেদ করিয়া দেবদুর্লভ ঐশ্বর্য্যের শীতল আলোকের রশ্মি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে! তিনি আর একটি পদও অগ্রসর হইলেন না, ভাববিভোর হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। শরীরে ঘনঘন রোম-হর্ষ হইতে লাগিল, নয়ন-প্রান্তে অশ্রুবারি উছলিয়া পড়িল; ভক্তিগদগদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—স্থির হও, সুন্দরি! স্থির হও; সেই বৃদ্ধ অতিথি কি আর মানুষ যে, তাঁহাকে বাহিরে খুঁজিতে যাইব? দয়া করিয়া ধরা দিলে ভিতরে থাকিয়াই তাঁহাকে পাওয়া যায়, আর ধরা না দেন তো ভিতর-বাহির ঢুঁড়িয়া বেড়াইলেও কিছুই হই-

বার যো নাই। সেই প্রাচীন পুরুষকে কোথায় খুঁজিয়া বেড়াইতে যাইব বল? তিনি আছেনও সব ঠাঁই, আবার নাইও কোথাও। দেখা দেন তো এইখানেই দিবেন, না দেন তো কোথাও দিবেন না। এখনও তাঁকে চিনিতেছ না সুন্দরি? যাঁহার পাদস্পর্শে কাষ্ঠের তরী সুবর্ণময় হইয়াছিল, যাঁহার শ্রীচরণসংস্পর্শে পাষাণী মানবী হইয়াছিল, যাঁহার অঙ্গ-সঙ্গে কুব্জা রূপসী হইয়াছিল, এ কার্য্য তিনি ছাড়া অন্য কেহ করিতে পারে কি? তোমার আমার চেহারা দেখিয়াও কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না? যিনি এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, সেই আদি পুরুষই এই প্রাচীন পুরুষ জানিও। এই আমূল পরিবর্ত্তন ব্যাপার সেই চক্রধারীর চক্রেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে, অন্যের পক্ষে ইহা আকাশকুসুমের মত কল্পনারই সামগ্রী। সতি! সতি! এস আমরা তাঁহার শরণাগত হই, কাতর-কণ্ঠে তাঁহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। হায় হায়, আমরা তাঁহাকে সামান্য মানুষই মনে করিয়াছিলাম! হায় হায়, না জানি তাঁহার সেবায় আমাদের কতই না ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। হায় হায়, আমরা পেয়ে রত্ন হারাইয়া ফেলিলাম!

"ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি সুরাসুর। স্তুতি করন্তি যা পয়র॥
কমলা যার পরিচার। মো ছার কেতেক মাতর।
ভো প্রভু করুণাসাগর। মো অপরাধ ক্ষমা কর॥
ভৃত্য হোইলে অপরাধী। তু নাথ করুণাবারিধি॥
তুম্ভে যে ব্রহ্মাণ্ডঠাকুর। জীবঙ্ক হৃদরে বিহর॥
এণু অপ্রাধ মোর যেতে। প্রভু ন ঘেন কদাচিতে॥"

হায় হায়, ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ এবং অসুরগণ যাঁহার পাদ-পদ্মের স্তব করিয়া থাকেন, কমলা যাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্তা, ছার আমি আবার তাঁহার নিকট একটা পদার্থই বা কি? প্রভু হে করুণাসিন্ধু! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ভৃত্য না হয় অপরাধীই হইয়াছে, কিন্তু তুমি তো ঠাকুর করুণার অপার পারাবার। তোমার করুণার তোড়ে সে অপরাধ তো তিষ্টিতেই পারে না। নাথ! তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিপতি, সকল জীবের হৃদয়ে-হৃদয়ে তুমি বিহার করিয়া থাক, তোমার অজ্ঞাত আর কি আছে; তাই প্রার্থনা—আমাদের এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ কখনও গ্রহণ করিও না প্রভু!

দামোদর দাস ও তাঁহার পত্নী বহুক্ষণ ধরিয়া প্রভুর এই-রূপ স্তবস্তুতি করিলেন, কত কাঁদিলেন, ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিলেন, তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া মহামহোৎসবের আয়োজন করি-লেন। ভগবানের সেবা, অভিন্ন-ভগবান্ ভগবদ্ভক্তের সেবা, গো-ব্রাহ্মণ-সেবা প্রভৃতি পুণ্যানুষ্ঠান করিতে-করিতে তাঁহারা গোণা দিন ফুরাইয়া দিলেন। দেহাবসানে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া দিব্যদেহে বৈকুণ্ঠনাথের সেবা করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্র।

শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে জয়নগর রাজ্য। রাজা জয়সিংহ সেই রাজ্যের অধিপতি। তিনি নানা গুণে গুণী; ধনে কুবেরের মত, দাতৃত্বে কর্ণের মত, বীরত্বে অর্জ্জুনের মত, ধৈর্য্যে ধরণীর মত, বিদ্যায় সরস্বতীর মত এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতির মত ছিলেন। তাঁহার দ্বারে লক্ষাধিক অশ্ব নিরন্তর বাঁধা থাকিত, পদাতী সৈন্যের তো সংখ্যাই নিরূপিত হইত না। তিনি দীন-দুঃখীর মাতা-পিতা। মোলায়েম মিষ্ট কথা তাঁহার হাঁসিমুখে লাগিয়াই আছে। হরিভজনেও অনুরাগ যথেষ্ট ছিল। যেমন তিনি, সহধর্ম্মিণীও তেমনি। তিনিও রূপেগুণে ধন্যা ছিলেন। নাম চন্দ্রাবতী। তাঁহার মত স্বামিসেবায় অনুরাগ লক্ষের ভিতর একজনেরও হয় কি না সন্দেহ। রাজা-রাণীর একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্রটি যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। কন্যাও কম নন; বর্ণ যেন কাঁচা সোণা, মুখখানি সদাই হাস্যপ্রফুল্ল, যেন পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ভেঙ্গে-চুরে গড়া—সে শোভার আর তুলনা নাই। তাঁহার সেই কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশ-কলাপ, খঞ্জন-গঞ্জন নয়ন, বিদ্রুম-সুন্দর সুরঙ্গ অধর, মুকুতার মত দন্ত, উচ্চ বিস্তৃত বক্ষঃস্থল, কোমল বাহুলতিকা প্রভৃতি দেখিলে মুনির মনও টলিয়া যায়। এই বিশ্ববিজয়িনী সুষমার-অক্ষুরন্ত-খনি রমণীমণির নাম শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া। মাতা-পিতা পুত্রের অপেক্ষাও ইঁহাকে অধিক ভালবাসেন। বাসিবারই কথা, কেন না যে সকল

সদ্‌গুণ থাকিলে মানুষ মানুষকে ভালবাসিয়া থাকে, তাঁহাতে তাহা পূর্ণ মাত্রাতেই ছিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণ ছাড়া কিছুই জানেন না। কৃষ্ণকথা শুনিতে-বলিতে তিনি বড় ভালবাসেন। ভগবানের পবিত্র চরিত্র অনুক্ষণ পঠন ও শ্রবণ করেন। সাধু-বৈষ্ণবের সেবার জন্য মঠে-মন্দিরে গোপনেগোপনে ধন প্রেরণ করিয়া থাকেন। স্থানে-স্থানে সদাব্রত স্থাপন, শুদ্ধভাবে ও দৃঢ়চিত্তে বিবিধ ব্রত অনুষ্ঠান তো তাঁহার নিত্য-কর্ম্ম। তীর্থভ্রমণকারী সাধু-মহাত্মার মুখে তীর্থকথা শুনিতেও তাঁহার একান্ত আসক্তি। একদিন কোন তৈর্থিকের মুখে কথায়-কথায় শ্রীজগন্নাথের কথা শুনিয়া তাঁহার মন-প্রাণ গলিয়া গেল। সেই অবধি তিনি যখন-তখন জগবন্ধুর কথা মনেমনে ভাবনা করি-তেন। ভাবিতে-ভাবিতে নীলাচলনাথের অপার করুণার কথা, মহাপ্রসাদের অপরিসীম মহিমার কথা ও প্রভুর রথযাত্রা প্রভৃতি লীলার কথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিত, আর অমনি আনন্দে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে-করিতে গদ্গদবচনে বলিতেন, হায়, কবে আমি সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিব, কবে আমি সেই দারুব্রহ্মের দর্শনলাভ করিব, কবে আমার সর্ব্বপাপ বিমোচন হইবে, কবে আমার ভব-বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে? হায়, আমি যে ছার রমণীজাতি, আমার কি আর সে সৌভাগ্য ঘটিবে? নাথ! এ চর্ম্মচক্ষে তোমার সাক্ষাৎ দর্শন ভাগ্যে ঘটুক আর না-ই ঘটুক, একদিন কৃপা করিয়া স্বপ্নেও কি দেখা দিতে পার না? স্বপ্নে দেখা পাইলেও অভাগিনী আমি মহাভাগ্য বলিয়া মনে করিব। কৃষ্ণপ্রিয়া

প্রেমভরে এই কথা বলেন, আর তাঁহার নয়ন দিয়া দরদর প্রেমের ধারা বহিয়া যায়,—বদন বক্ষ ভাসাইয়া ধরাতল সিক্ত করিতে থাকে।

শ্রীজগন্নাথেরই ইচ্ছা বলিতে হইবে, ঐ সময় তাঁহার একজন সেবক জয়নগরে আসিলেন। জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহার পার্ষদ মধ্যেই পরিগণিত, তার উপর তিলিচ্ছ মহাপাত্রের ঘর বড়ই সম্মানিত। ইনি সেই তিলিচ্ছ মহাপাত্রের পূর্ব্বপুরুষ, নাম—বন্ধু মহাপাত্র। ধন্য ধনলালসা, বন্ধু মহাপাত্র সামান্য ধনের লোভে জগবন্ধুর সেবা ছাড়িয়া নানাবিধ পথক্লেশ সহ্য করিয়া সুদূর পশ্চিমপ্রদেশে আসিয়াছেন। তিনি ধনবান্‌দিগের গৃহেগৃহে গমন করিয়া শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য দান করেন, তাঁহারাও আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া প্রচুর ধনরত্ন দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। এইরূপে বন্ধু মহাপাত্র অনেক ধন উপার্জ্জন করিলেন। তিনি জয়নগরে থাকিতে-থাকিতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণপ্রিয়ার কীর্ত্তিকাহিনী শুনিতে পাইলেন। মনেমনে ভাবিলেন,—কৃষ্ণপ্রিয়ার যখন জগন্নাথে অত ভক্তি, তখন জগন্নাথের নামে তাঁহাকে একখানি পত্র লিখি, অনেক ধন পাওয়া যাইবে। তিনি তখনই কৃষ্ণপ্রিয়াকে একখানি পত্র লিখিলেন।

"শ্রীজগন্নাথঙ্ক নিমন্তে। যে শ্রদ্ধা হেব তুম্ভ চিত্তে॥
দেলে সে আম্ভে নেনি যিবুঁ। প্রভু ছামুরে নেই দেবুঁ॥"

রাজবালা! আমি শ্রীজগন্নাথের সেবক—পারিষদ লোক, তোমার যদি শ্রদ্ধা হয়, শ্রীজগন্নাথের নিমিত্ত যদি কিছু দিবার ইচ্ছা হয়, তবে

আমার কাছেই দিতে পার ; আমি তাহা লইয়া গিয়া প্রভুর সম্মুখে ধরিয়া দিব।

বন্ধু মহাপাত্র পত্রখানি মুড়িয়া লোকদ্বারা কৃষ্ণপ্রিয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন। লোক যাইয়া রাজনন্দিনীকে পত্রখানি প্রদান করিল। জগন্নাথের পারিষদের পত্র শুনিয়া কৃষ্ণপ্রিয়ার আনন্দ আর ধরে না। তিনি পত্রখানি একবার বুকে ধরেন, একবার মাথায় ধরেন, মোড়কের মুখে ঘনঘন চুম্বন করেন; যেন সাক্ষাৎ জগন্নাথকেই পাইয়াছেন। মোড়ক খুলিয়া তিনি পত্রখানি পাঠ করিলেন। এক-বার নয়, দুইবার নয়, শতশত বার পড়িলেন। তাঁহার নেত্র দিয়া অশ্রুর প্রবাহ বাহির হইয়া পড়িল। হস্ত থরথর কাঁপিয়া উঠিল। পুলক-কদম্বে সকল অঙ্গ পূরিয়া গেল। বিন্দু বিন্দু স্বেদবারিও দেখা দিল। কণ্ঠস্বর গদ্গদ হইয়া আসিল। বিম্ব-বিনিন্দিত অধরোষ্ঠ থাকিয়া-থাকিয়া কাঁপিতে লাগিল। আবোল-তাবোল কত কি বলিতে-বলিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি ভাব-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। নিমীলিতনয়নে দেখিলেন,—শঙ্খ-চক্রধারী শ্রীহরি তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন। আবার নয়ন মিলিয়া দেখেন, তিনিই তাঁহার নয়নে-নয়নে। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিল। বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি মহা চিন্তায় পড়িয়া গেলেন ; তাইতো করা যায় কি, আমি সেই জগন্নাথকে কি দ্রব্য দান করি? হায়, মহালক্ষ্মী যাঁহার ঘরণী, অষ্টনিধি যাঁহার পরিচারক, বিধাতা যাঁহার আজ্ঞাবহ, রত্নাকর যাঁহার নিজ নিবাস, তাঁহার আবার অভাব কিসের? এই বিশ্বসংসার ভরণ করেন বলিয়াই যিনি বিশ্বম্ভর,

তাঁহাকে দিবারই বা কি আছে? হাস্যেরই কথা,—জগন্নাথকে কিছু দিতে হইবে!

অহো! যাঁহার দর্শনে পাপীর পাপতাপ দূরে যায়, মহাপ্রলয়েও যাঁহার পৃষ্ঠদেশ টলে না, সেই নীলাচল-পীঠ যাঁহার নিবাসস্থল, তাঁহাকে আমি আবার বসিবার কি পীঠ (পিঁড়া) প্রদান করিব? পতিতপাবনী সুরধুনী যাঁহার পাদসলিল, তাঁহার উপযুক্ত পাদ্য এ জগতে কোথায় মিলিবে? অম্লান-পারিজাত-মাল্য যাঁহার গলদেশে সতত বর্ত্তমান, তাঁহাকে আমি কোন্ নশ্বর ফুল উপহার দিতে যাইব? অমূল্য অগুরু চন্দন যাঁহার ভোগরন্ধনের ইন্ধন, তাঁহাকে দিবার চন্দন কি আছে? উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি যাঁহার বক্ষে বিরাজিত, তাঁহাকে উপহার দিবার উপযুক্ত মণি কোথায় পাইব? পক্ষিরাজ গরুড় যাঁহার বাহন, অশ্ব-গজাদি বাহনে তাঁহার কি হইবে? যাঁহার ফণায় ফণায় অমল মণি ঝলমল করিতেছে, সেই সহস্র-ফণ নাগরাজ যাঁহার শয্যা, আমাদের তুচ্ছ শয্যা কি তাঁহাকে সাজে? কোটি-সূর্য্যসম-তেজোদীপ্ত সুদর্শন যাঁহার অস্ত্র, তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্রই বা কি দান করিতে যাইব? হে প্রভু! এই চতুর্দ্দশ ভুবনের কোন সামগ্রীই তো তোমাকে দিবার উপযুক্ত দেখিতে পাইতেছি না। হৃদিহারি, তুমি হৃদয়ে-হৃদয়েই বলিয়া দাও,—কোন্ সামগ্রী তোমায় দিতে হইবে, কি বস্তু পাইলে তুমি প্রীত হও।

কৃষ্ণপ্রিয়া এইরূপ বলিতে-বলিতে যেন কিছুক্ষণ ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র হইয়া রহিলেন। তারপর অকস্মাৎ হাসিতে-হাসিতে বলিয়া

উঠিলেন,—হাঁ হাঁ, এইবার তোমার কিসের অভাব, তাহার হদিস্ পাইয়াছি পাইয়াছি।—

"আবর কুলকন্যাগণ। নাগরী চতুরী সিহান॥
তুম্ভর মন নেলে হরি। রখিলে অতি গোপ্য করি॥
যেতে মাগিল মহাবাহু। লেউটি ন দেলে সে আউ॥
ক্ষীর-নীরর প্রায় হেলা। মনরে মন মিশি গলা॥
খোজি ন পাই বর্ণ চিহ্ন। কেবল হেলা মহাশূন্য॥
আউ সকল দ্রব্য অছি। তোতে অপূর্ব্ব নাহিঁ কিছি॥
মন মাত্রক লবলেশে। নাহি তুম্ভর হৃদদেশে॥"

শ্রীবৃন্দাবনের চতুরী সিয়ানী নাগরী গোপকন্যাগণ তোমার মন হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে, তুমি কাকুতি-মিনতি করিয়া কতই না প্রার্থনা করিলে, কিন্তু কই তাহারা তো আর তোমার মন তোমাকে ফিরাইয়া দিল না। দুধে জলে মিশা-মিশির মত তাদের মনে আর তোমার মনে এমন মিশামিশি হইয়া গিয়াছে যে, আর তার বর্ণচিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া ভার। সে যেন শূন্যে শূন্য মিশিয়া মহাশূন্য হইয়া গিয়াছে। তাই মনে হয়, তোমার আর যত দ্রব্য থাকিতে হয় থাকুক, অন্য অভাবও কিছু না থাকুক, কিন্তু তোমার অন্তরে মনের ছিটে-কোঁটাও নাই, সেই মনের খাঁকৃতিই তোমার একমাত্র অভাব।

বেশ কথা, উত্তম কথা, যাহার অভাব তাহাই তোমাকে দিতেছি। ধর, এই আমি আমার মন তোমাকে দান করিলাম। এখন হইতে আর আমি আমার নই, তোমার কেনা-দাসী হইয়া রহিলাম। এতদিন আমার মন আমাকে যাহা বলাইত, তাহাই

বলিতাম, যাহা করাইত, তাহাই করিতাম, অতঃপর আর তাহা করিব না; তুমি আমায় যাহা বলাইবে, তাহাই বলিব, যাহা করাইবে, তাহাই করিব। কোন আদেশের প্রতিবাদ করিব না।

সুন্দরী মনেমনে এই সকল কথা বলিয়া শ্রীজগন্নাথের নামে মনের দানপত্র লিখিতে বসিলেন। বসিলেন বটে, কিন্তু এ নয়নে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অশ্রুতে নয়ন দুইটী ভরিয়া গেল, যেন কেমন ভিতরটানেও মুদিয়া আসিতে লাগিল। প্রেমরাজ্যের বুঝি সকলই অস্ফুট—সকলই আধো আধো। প্রেমের উদয় হইলে ভাষাও ফোটে ফোটে ফোটে না, ভাবও ছোটে-ছোটে ছোটে না, কথাও জোটে-জোটে জোটে না। প্রেম বুঝি সকল সামগ্রীই এলোমেলো করিয়া দেয়। প্রেমিকও বুঝি তাই এলোথেলো হইয়া পড়েন। কৃষ্ণপ্রিয়াও প্রেমের প্রাবল্যে এলোথেলো হইয়া কম্পিত-করে জড়িতজড়িত অক্ষরে দানপত্রখানি লিখিয়া ফেলিলেন।

ওহে ও জগতস্বামি!
এ বিশ্ব-সংসার, সকলি তোমার,
তোমারে কি দিব আমি॥
(সুধু) মনটি তোমার নাই।
যত গোপনারী, রেখে দেছে হরি,
তাহা তো তোমার চাই॥
এই ধর নাও মন।
দিয়া হ'নু দাসী, নীলাচলশশি,
দানপত্র এ লিখন॥

কৃষ্ণপ্রিয়া মম নাম।
জয়সিংহ পিতা, চন্দ্রাবতী মাতা,
জয়নগরেতে ধাম ॥

পত্রখানি লেখা হইয়া গেল। আহা, নয়নজলে সেখানি ভিজিয়া জব্‌জবে হইয়া গিয়াছে। তিনি একখানি খামের মধ্যে প্রেমাশ্রুসিক্ত পত্রখানি রাখিলেন। অন্য জলের আবশ্যক হইল না, প্রেমাশ্রু-জলেই তাহা আঁটিয়া ফেলিলেন। তাহার উপর মোহর করিয়া দিয়া আপন মনের প্রতি বলিতে লাগিলেন,—

"বোইলে—শুন আরে মন। তু ত দুর্জ্জয় মহাশূন্য ॥
নিশ্চল নোহ কদাচিতে। তেণু মাগুছি মুহিঁ এতে ॥
গোবিন্দচরণে রহিবু। নিশ্চল হোই একা থিবু ॥
এহি সুদয়া মোরে হেউ। লেউটি ন আসিবু আউ ॥"

আরে মন! তুই তো মহাশূন্য স্বরূপ, তোকে জয় করা তো সহজ নয়; কিছুতে তুই নিশ্চলও হইস্ না; তাই তোর কাছে প্রার্থনা করি,—তুই এখন নিশ্চল নিঃসঙ্গ হোয়ে শ্রীগোবিন্দের পাদ-পদ্মে থাকিবি, দেখিস্ যেন সেখান থেকে আর ফিরিয়া আসিস্ না; আমার প্রতি তোকে এইটুকু দয়া করিতেই হইবে।

কৃষ্ণপ্রিয়া সখী আনন্দাকে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে সেই পত্রখানি এবং দশটী সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন,—সখি! যাও, শীঘ্র যাও, সেই শ্রীজগন্নাথের সেবকের হস্তে এই পত্রখানি দিয়া এস। তাঁহাকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া প্রণামিস্বরূপ সুবর্ণমুদ্রা দশটী দিও, আর বিনয়-বচনে বলিও, তিনি যেন দয়া করিয়া সেই নীলাদ্রিনাথকে

এই দানপত্রখানি দান করেন, আমার তাঁহাকে যাহা কিছু দিবার, তাহা এই পত্রমধ্যেই রহিল।

আনন্দা ত্বরিতগতিতে বন্ধু মহাপাত্রের নিকটে গমন করিলেন এবং বিনয়বাক্যে প্রণামী ও পত্র দিয়া কৃষ্ণপ্রিয়ার কাকুতি-মিনতি জানাইলেন। মাত্র দশটী সুবর্ণমুদ্রা দেখিয়া মহাপাত্র তো চটিয়াই লাল। আনন্দার কথার কোন উত্তর না দিয়া কেবল মাথা নাড়িয়া অভিমতি জানাইয়া সত্বর সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। মনে মনে বলিলেন,—ওঃ, জয়সিংহের কন্যা তো ভারি দানশীলা দেখিতেছি, জগন্নাথের নাম করিয়া প্রার্থনা জানাইলাম, তাহার বিনিময়ে পাইলাম কিনা দশটী মুদ্রা! ধিক্ তার দানশীলতায়, ধিক্ তার বৃথা প্রশংসায়। দেখি, পত্রখানা খুলিয়াই দেখি, এর ভিতরে আবার জগন্নাথকে যা দিবার কি অপূর্ব্ব সামগ্রী দিয়াছেন। মহাপাত্র পত্রখানির একবার এদিক্-ওদিক্ দেখিলেন, হাতে করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া ভারি কিনা পরীক্ষা করিয়া লইলেন; তারপর মুখভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—হাল্‌কা ফন্‌ফনে একরত্তি পত্র, তার ভিতরে আবার কি থাকিবে বল; ও সব ভুয়া কথা, পত্রের ভিতর কিছুই নাই—কিছুই নাই। এই বলিয়া তিনি ফড়ফড় করিয়া খানখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং হিজিবিজি লেখা দেখিয়া দূর করিয়া পত্রখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

হায় ধনলুব্ধ পণ্ডা, তুমি ও পত্রের কদর কি বুঝিবে? তোমার তো প্রেমনেত্র নাই, তুমি কি ও লেখা পড়িতে পার? পড়িতে পারিলেও কি তোমার লোভকলুষিত হৃদয়ে উহার ভাব ধারণ করিতে

পারিবে? কথনই না,—কথনই না? কৃষ্ণপ্রিয়া যাঁহাকে প্রাণেপ্রাণে বসাইয়া এই পত্র লিখিয়াছেন, হয় তিনি, না হয় তাঁহার অনুগৃহীত জন ছাড়া অন্য কেহই এ পত্রের ভাব বুঝিবেন না,—বুঝিবেন না।

বন্ধু মহাপাত্র সেদেশে আর থাকিলেন না। যাহা কিছু ধনরত্ন পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়াই স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং কয়েকমাস পরে শ্রীক্ষেত্রধামে আসিয়া পঁহুছিলেন। প্রথমেই দেউলে গিয়া শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিলেন এবং দুঃখ-সুখের কথা জানাইয়া আপন ভবনে চলিয়া গেলেন।

এদিকে হইয়াছে কি? বন্ধু মহাপাত্র যাই কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্রখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বগত জগন্নাথও অমনি শ্রীহস্ত বিস্তার করিয়া সেখানি ধরিয়া লইয়াছেন। আহা, ভক্তের ভাবে ভোলা ভগবানের তাহাতে আনন্দই বা কত।

"যেসনে অতি দীন জন। পাইলে অমূল্য রতন॥
যেতে আনন্দ মন তার। তহুঁ অধিক দামোদর॥
জন্মরু অন্ধ হোই থাই। সে যেহ্নে দিব্য চক্ষু পাই॥
কিঅবা শতে জন্ম যাএ। যেবা অপুত্র হোই থাএ॥
পাইলে উত্তম নন্দন। যেমন্ত হোএ তার মন॥
তহুঁ আনন্দ গলা বলি। তেসন হেলে বনমালী॥"

অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি যদি অমূল্য রতন পায়, তাহার মনে তখন যে আনন্দ, দামোদরের এ আনন্দ তাহার অপেক্ষাও অধিক। জন্মান্ধ ব্যক্তি দিব্য দৃষ্টি লাভ করিলে কিংবা শতজন্মের অপুত্র উত্তম পুত্র প্রাপ্ত হইলে যে প্রকার আনন্দে মাতিয়া উঠে, বনমালীর এ আনন্দ তাহার চেয়েও অনেক বেশী।

অহো, ভক্তগণ না-জানি কি-এক সামগ্রী মাখাইয়া ভগবানকে সকল সামগ্রী সমর্পণ করেন, যাহা আত্মানন্দে পরিপূর্ণ আনন্দময়ের হৃদয়েও আনন্দের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া দেয়। ভক্তের নিজস্ব সেই অসীম-শক্তি সামগ্রীর জয় হউক!

করুণাময় করিলেন কি, কৃষ্ণপ্রিয়ার সেই পত্রখানি লইয়া পট্টসূত্র দিয়া বাঁধিলেন এবং প্রেমে গরগর হইয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন। কৌস্তুভমণির সহিত কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্রখানিও তাঁহার হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল।

সেইদিনই রজনীযোগে জগন্নাথ বন্ধু মহাপাত্রের ঘরে গমন করিয়া স্বপ্নযোগে বলিলেন,—ওহে ও মহাপাত্র! তুমি যে সামান্য ধনের আশায় আমার সেবা ছাড়িয়া জয়নগরে গমন করিয়াছিলে, তাহার জন্য আমি তোমাকে কিছুই বলিতে চাহি না। তুমি নিজে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছ, তাহার অংশ লইতেও আমি আসি নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আমার ধনে তুমি আমাকে বঞ্চিত করিলে কি নিমিত্ত? কৃষ্ণপ্রিয়া তোমার হস্তে আমায় যাহা প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা আমার অমূল্য রতন, তুমি কিনা তুচ্ছ পদার্থের মত তাহা দূর করিয়া ফেলিয়া দিলে? কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্রখানিকে তুমি সামান্য মনে করিও না; তাহা আমার আকল্প সঞ্চিত ধন। আর তুমি কিনা সামান্য কাগজ মনে করিয়া তাহা ফেলিয়া দিলে? তুমি ফেলিয়া দিলেও আমার সম্পত্তি আমি ছাড়ি কি প্রকারে? এই দেখ বিপ্র! আমি তাহা তখনই লইয়া আসিয়াছি। এই দেখ,— আমার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখ, পরম আদরে তাহা হৃদয়েই